প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক

নবপত্র প্রকাশন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯২৪

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রিট / কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

পাঁক

প্রেমের উপন্যাসগুচ্ছ—১

লেখকের নিবেদন

'পাঁক' আমার সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই।

শুধু প্রকাশিত নয়, প্রকাশের উপযুক্ত রচনা হিসেবেও এটিকেই প্রথম রচনা বলা যেতে পারে।

তার আগে যা লিখেছি তাব মধ্যে সম্পূর্ণ কোন উপন্যাস নেই। গল্প কবিতা প্রবন্ধও যা লিখেছি তাও প্রকাশ করার কোন চেষ্টা করিনি। প্রকাশ করাব যোগ্য বলেই সেগুলিকে মনে হয়নি।

'প্রবাসীতে' প্রকাশিত যে দুটি গল্প দিয়ে আমার সাহিত্য-জীবন শুরু তারও অনেক আগে 'পাঁক' লেখা আরম্ভ হয়েছে। বাঁধানো রুল-টানা খাতায় 'পাঁক' লেখা যখন শুরু করি, তখন আমি স্কুলের ছাত্র।

কথাটা জানানোর মধ্যে কোন বাহাদুরী নেবার চেষ্টা নেই। কারণ, স্কুলের ছাত্র হিসেবে লেখা শুরু করায় নিজেকে অদ্বিতীয় মনে করার মতো বাতুল আমি নই।

সত্যি কথা বলতে গেলে ছাত্রাবস্থায় লেখা শুরু করেননি এমন লেখকের সংখ্যাই বোধ হয় কম। বরং সে দিক দিয়ে আমি অনেকেরই পিছনে আছি বলা যায়। কারণ চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের আগে সাহিত্য রচনার চেষ্টা দূরে থাক, কোন বাসনা পর্যন্ত আমার মধ্যে ছিল না। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় 'পাঁক' লেখা শুরু করেছিলাম এ-কথাটা, কতকটা সাফাই ও কতকটা প্রয়োজনীয় সংবাদ হিসেবেই জানালাম।

অল্প বয়সের লেখা হিসেবে 'পাঁক' উপন্যাসটিতে দুর্বলতা ও ত্রুটির যে অভাব নেই, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। সাফাইটা সেই কারণেই।

কিন্তু সংবাদটারও একটু প্রয়োজন আছে। যত দোষ-ত্রুটিই থাক 'পাঁক' উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রথম যে একটু নতুন রাস্তা খোঁজার চেষ্টা ছিল, একথা নিন্দুকেরাও স্বীকার করেন। সেই নতুন রাস্তার হদিস্ কি করে পেয়েছিলাম তাই বোঝানোর পক্ষে সংবাদটার কিছু মূল্য আছে।

সময়ের গতিকে দুনিয়ার অনেক কিছু বদলায়। আজ যাতে শির দিতে হয় কাল তারই জন্যে মেলে শিরোপা।

আর কিছু না হোক বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদী সাহিত্যিক হয়ে বাহবা পাওয়া আজকাল সহজ হয়েছে বলে শুনতে পাই। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', গল্পে উপন্যাসে কোথাও একটু থাকলেই নাকি প্রগতিবাদের পরীক্ষায় পাশ। শুধু শ্রমিক নয়, শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে তাত্ত্বিক্ করে দুটো কথা লিখতে পারলেই সাহিত্যের সেরা তক্‌মা।

ব্যাপারটা আমি কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করি না। হুজুগের হাওয়া বুঝে হাততালি দেওয়ার মতো লোক চিরকালই ছিল, আরো বহুকাল হয়তো থাকবে। কিন্তু তাদের বিচারই সাহিত্য-শিল্পের শেষ কথা নয়। যে আন্দোলনের গতি ও লক্ষ্য সত্যই সামনের দিকে, তার পুরোহিতদের দৃষ্টি অন্ততঃ এ মূঢ় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে না হলে আন্দোলনই নিষ্ফল বলে আমার মনে হয়। তাই, কষ্টী নিয়ে কলম ধরলেই চণ্ডীদাস হয়, এ মতের মাতব্বরদের গলাবাজী গ্রাহ্য কববার নয় বলেই আমি মনে করি।

তবু এ কথা ঠিক যে হাওয়া আজ বদলেছে। উপন্যাসের নাম 'পাঁক' হ'লে, লেখকের গায়ে তাই মাখিয়ে সমালোচনা শুরু করার বেওয়াজ অন্ততঃ আর নেই।

আমাদের সময় তাই ছিল।

নির্বিচারে সাহিত্যের পিঁড়ি পাবার আজ যা পৈতে হয়েছে অনেকেব কাছে, তাই ছিল তখনকার দিনে পঙ্‌ক্তি থেকে বাতিল হবার মতো পরিচয়।

'বাদ' বিসংবাদ তখনও সাহিত্যে এখানকাব চেহারায় দেখা দেয়নি।

তাই সাহিত্যের সিধে সড়ক ছেড়ে নতুন কোন দিকে অভিযান প্রাণ ও মান হাতে নিয়েই সেদিন করতে হয়েছে নিজের দুঃসাহস মাত্র সম্বল করে!

'পাঁক' লিখতে শুরু হবার পিছনে সে-রকম কোন দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্কল্প ছিল বলতে পারলে ভালই শোনাতো বুঝতে পারছি, কিন্তু সে বাহাদুরী-টুকুও নেবার সৌভাগ্য নেই।

জীবনের এই প্রথম উপন্যাস লিখতে গিয়ে নতুন পথ খুঁজেছিলাম সত্য, কিন্তু দুঃসাহসিক কিছু করতে যাচ্ছি এ মনোভাব যথার্থ তখন ছিল না। পাঁকের চরিত্র ও পবিবেশ নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে আপনা থেকেই আমার মন সেদিন অধিকার করেছিল।

স্কুলে যেতে লম্বা একটা আঁকা-বাঁকা গলি বেরুতে হ'ত।

সেই গলির একটা বাঁকের পাশে মস্ত একটা নোংরা পুকুর। চারপাশে বেশীর ভাগ নারকেল পাতা আর দু-একটা ভাঙা খোলায় ছাওয়া গবীবদের বস্তি। কলকাতা শহরে ও-ধরনের পুকুর-ঘেরা বস্তি এখন আর নেই বললেই হয়।

আমার স্কুল-জীবনের সঙ্গে ওই পুকুর-ঘেরা বস্তির ক্রমিক পরিণতির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রথম যখনকার স্মৃতি মনে আসে তখনই পুকুরটি ভরাট হচ্ছে রাবিশে, জঞ্জালে, পানায়। স্কুলের নীচু ক্লাস থেকে আমি ওপরে উঠেছি। পুকুরটি তার মধ্যে ধীরে ধীরে কখন ভরাট হয়েছে, কখন তার ধারের কুড়েগুলো আরো জট পাকিয়ে গলির কাছে ঘেঁষে এসেছে, সঠিকভাবে মনে করতে পারি-

না, কিন্তু বহু বছরের যাতায়াতের পথে ওই বস্তির জীবনযাত্রা অলক্ষ্যে আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে।

পুকুর হারিয়ে বস্তির জীবনধারা যখন গলির বাঁকের সরকারী কলে সীমাবদ্ধ হয়েছে, তখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে আমি পড়ি। সাহিত্যচর্চার আকস্মিক খেয়ালে হঠাৎ একদিন কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম।

বসলাম তো বটে, কিন্তু লিখব কি নিয়ে?

সবাই যা করে তা না-করার, আর সকলের থেকে একটু আলাদা হবার যে ধর্ম জীবনের মজ্জাগত তারই প্রেরণায় বোধ হয় গলির পথে যেতে-আসতে যাদের দেখেছি তাদের নিয়ে প্রথম উপন্যাস শুরু করলাম।

শুরু করলেও এ উপন্যাস নিজের উৎসাহে শেষ বোধ হয় হ'ত না।

বাঁধানো খাতায় লেখা এ উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ অসমাপ্তই বোধ হয় থেকে যেত, ঘটনার যোগাযোগে কয়েকজন বন্ধুর সমর্থন ও উৎসাহ যদি না পেতাম।

একে তখনকার দিনের পক্ষে উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটু বিসদৃশ, তার উপর নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজের স্বাভাবিক সঙ্কুচিত ধারণা—এই দুই কারণে লেখাটি আমি বাতিল হিসেবেই ফেলে রেখেছিলাম।

এ লেখা আবিষ্কার ও জোর করে প্রকাশ করলেন 'কালি-কলমে'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীমুরলীধর বসু। 'কালি-কলম' অবশ্য তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

মুরলীবাবু,—আমাদের মুরলীদা তখনও স্কুলে মাস্টারী করার অবসরে সাহিত্যচর্চা করেন। নিজের লেখার চেয়ে পরের লেখা নিয়ে মেতে থাকেন বেশী। অচিন্ত্য, আমি, শৈলজানন্দ ও মুরলীদা তখন নিত্য সঙ্গী।

কথায় কথায় একদিন 'সংহতি' কাগজের জন্যে একটি উপন্যাসের কথা উঠল। সে 'সংহতি' বন্ধুবর সুরেন্দ্র নিয়োগীর এখনকার কাগজ নয়। শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পালের সম্পাদিত আর-একখানি চটি কাগজ, প্রেস কম্পোজিটারদের একটি দুর্বল শিশু সঙ্ঘ বুঝি তার পেছনে ছিল।

পারিশ্রমিক দেওয়া তো দূরের কথা 'সংহতি'র নাম-ডাকও কিছু নেই যে তাতে লেখা দিলে লোকের চোখে পড়বে।

কিন্তু হারের খেলা খেলবার নিষ্কাম আনন্দ যাদের মধ্যে দেখেছি মুরলীদা তাদের মধ্যে প্রধান একজন। সে খেলায় তিনি অন্যকেও মাতিয়ে তুলতে জানতেন। সংহতির জন্যে তিনি উপন্যাস চাইলেন আমার কাছে। ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে আমার কাঁচা হাতের প্রথম লেখার কথা জানালাম। তাঁর আর তর

সইল না। তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ি এসে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি টেনে নিয়ে গেলেন এবং দুদিন বাদে জানালেন 'সংহতি'তে পাঁক বেরুবে।

পাঁক 'সংহতি'তে বার হতে শুরু হ'ল। কতজনের চোখে সে লেখা পড়ল জানি না, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা তারিফ করলেন।

উপন্যাস তবু শেষ হ'ল না। আমার 'পাঁকে' পড়ে বোধ হয় 'সংহতি'র পরমায়ু শেষ হয়ে গেল।

আমি পাঁকের কথা ভুললাম, কিন্তু মুরলীদা সে পাত্র নয়। শ্রদ্ধেয় বারীন্দ্র ঘোষের হাত বদলে 'বিজলী' সাপ্তাহিক তখন কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের হাতে গেছে। মুরলীদা যথাচরিত্র তার নেপথ্য সেবায়েৎ। সংহতির 'পাঁক' তিনি 'বিজলী'তে আবার গিয়ে তুললেন। এবং এবারে বিজলীর দীপ্তি অন্ততঃ পাঁকে পড়ে নিভল না। উপন্যাস সত্যই শেষ হ'ল।

হাওয়া তখন বুঝি একটু বদলাতে শুরু করেছে। নামের দরুনই অযথা গালাগাল যেমন কম খেলাম না, অযাচিত অপ্রত্যাশিত প্রশংসা ও সমর্থও তেমনি পেলাম নিজের যোগ্যতার অতিরিক্ত।

সমর্থনের একটি নিদর্শন কোনদিন ভোলবার নয়। 'বিজলী' অফিসে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন একটি চিঠি এল। পোস্টকার্ডে লেখা কয়েকটি লাইন। 'বিজলী' সম্পাদকের মারফৎ আমার কাছে লেখা।

প্রশংসা নিন্দা তারপর জীবনে পাইনি এমন নয়। যা পেয়েছি তা আশা-আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্তও বলতে পারি। কিন্তু সেই প্রথম চিঠির উদ্দীপনার তুলনা হয় না।

সে চিঠি লিখেছিলেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী।

সারা জীবনের লেখায় তাঁর চিঠির যোগ্য জবাব কতটুকু দিতে পারলাম তাই ভাবছি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁক

এক

দুই রণচণ্ডীর আন্দোলনে আস্ফালনে মুচিপাড়া সেদিন দুপুরে সরগরম হয়ে উঠেছে। এমন তাদের রোজই হয়। তবে চড়ক সংক্রান্তির পরের দিনটায় কাজটা ভাল হয়নি, একথা সকলেরই স্বীকার করতে হবে।

পরস্পরে পরস্পরের সম্বন্ধে কতরকম জটিল, অসাধারণ ও অসম্ভব বিশ্লেষণ কল্পনা করতে পারে, ও গলাটাকে কতদূর পর্যন্ত তীক্ষ্ণ করা যেতে পারে, তার পরীক্ষা দিয়ে তখন তারা হয়রান হয়ে যে-যার নিজের ঘরের চৌকাঠে বসে' একটু বিশ্রাম করছিল।

দুবাড়ির মাঝখানে জমিটুকুতে বসে' প্রতিবেশীরা এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে-দুপক্ষের মামলা শুনে এখন মনোমত মন্তব্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। ন্যায্য কথা বলে বলে' কনে-বৌ-এর পাড়ায় একটু খ্যাতি ছিল, তার নিজেরও এ-বিষয়ে গর্ব ছিল কম নয়। কনে-বৌ এতক্ষণ নাত্‌নিকে দিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে উকুন বাছাতে বাছাতে ন্যায্য কথা খুঁজছিল বোধহয়; এইবার বেশ একটু ভনিতা করেই বললে, 'তোদেরও বলি বাছা, যদি তোদের দুদণ্ডও একসঙ্গে না বনে, একটু খুঁত পেলেই যদি চুলোচুলি করে' মরিস, তবে কেন দুজনে ফারাক থাক্ না! আবার গলাগলি করবার দরকার কি?'

তিনকড়ির বৌ কেউটের মতো ফোঁস্ করে' উঠে বললে, 'কে গলাগলি করতে যায়, কে? আমার কি মরবার দড়ি কল্‌সি জোটে না, উই শতেক্-খোয়ারীর সঙ্গে গলাগলি করতে যাব?'

কালাচাঁদের বোন পাঁচি, এতক্ষণ চৌকাঠের উপর বসে' মুখ ফিরিয়ে পচা-পুকুরের দিকে চেয়েছিল, এইবার মুখ ভেংচে বললে, 'না, গলাগলি করতে যাবি কেন? "ও পাঁচি, দুটো পয়সা দিতে পারিস? ও পাঁচি, দুটো বেগুন ধার দিবি?"— তখন যে সোহাগ আর ধরে না, আজ সকালে যে নেকী সেজে চাল চেয়ে নিয়ে গেছিস্! এখনো যে ভাত হজম হয়নি। আবার ফুটানি করিস্ কিসের?'

ঝগড়া হলেই এই ধারের খোঁটাটা পাঁচি প্রত্যেকবার দেয়, খোঁটাটাও সত্যি, তাই বড় লাগে। তিনকড়ির বৌ ক্ষেপে উঠে সকলের দিকে চেয়ে বললে, 'শোন তোমরা গো সবাই—এক কুনকে চাল দিয়ে—তাও ধার, ভালখাকীর খোঁটা শোন। তবু যদি তোর নিজের ঘর থেকে দিতিস্ পাঁচি, তবু যদি না ভায়ের ঘরের ঢেঁকি হতিস্!'

ভাই-এর ঘরে ঢেঁকি হয়ে থাকার লজ্জাটা পাঁচি নিজেই বড্ড বেশী করে' বুঝত, তাই এই নিদারুণ খোঁটাটা তাকে পাগল করে' তুললে। প্রায় কাঁদ-

কাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে' বললে, 'তোর বাবার কি রে মাগী? আমি আমার ভাই-এর ঘরের ঢেঁকি আছি তাতে তোর বাপের কি? তোর বাপের খাই আমি, না পরি? আ বেহায়া, লজ্জাও হয় না! ধার করে খেয়ে, কোঁদল করতে আসিস্! কেন তখন ভায়ের ঘরের ঢেঁকির কাছে হাত পাত্‌তে আসিস্! মর্ মর্, গলায় দড়ি দে।'

তিনকড়ির বৌ এর উপযুক্ত জবাব দিলে, 'আমি মরতে যাব কেন লা, কিসের দুঃখে, আমি তো আর ভাতারের মাথা খেয়ে তিনকুল পুড়িয়ে বসে নেই ডাইনি থুবড়ি হয়ে! যে মরলে সকলের হাড় জুড়োয় সে মরুক।'

এবার পাঁচি আর সহ্য করতে পারলে না, আঁচল চোখে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরের ভেতর চলে গেল।

কনে-বৌ চুল থেকে নাত্‌নির হাতটা সরিয়ে বললে, 'কিন্তু যাই বল বাপু, তোমার মুখখানির বড্ড ধার!'

তিনকড়ির বৌ খেঁকিয়ে বলল, 'ও আমার বাপ তুলবে কেন? আমি বলতে পারি না?'

'আমি বাপু ন্যেয্য কথা বলব, তাতে রাগই কর আর যা-ই ভাব। তুমি তো আগে ওকে ভাই-এর ঘরের ঢেঁকি বলেছ, তবে না ও বাপ তুলেছে! আর আজকের পরবের দিনটায় ওই কথাগুলো বলা ভাল হয়েছে তোমার? বলুক না সবাই।'

নিজেদের বিরুদ্ধে না হলে কনে-বৌ-এর ন্যায্য কথা সকলেরই ন্যায্য লাগত। সুতরাং সকলে সায় দিলে।

তিনকড়ির বৌ নিজের বিরুদ্ধে সকলকে সায় দিতে দেখে জ্বলে উঠে বললে, 'হ্যাঁ গো ভাল-বলুনীরা, সব জানা আছে। আমারই যত দোষ। তোমায় তো কেউ গায়ে পড়ে মোড়লনী হতে ডাকেনি বাপু। বেশ করেছি বলেছি।'

'আহা মুখ নয় তো যেন আঁস্তাকুড়।'

'আমার মুখ আঁস্তাকুড়ই তো বটে। ওই মুখের জ্বালায় ভাতারকে জ্বালিয়ে খেয়েছিস, ভাই-ভাজ দূর করে দিয়েছে, জোয়ান বেটা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে,—আমার মুখ তো আঁস্তাকুড় বটেই!' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনকড়ির বৌ ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাইরে থেকে ষাট বছরের কনে-বৌ রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'এত দেমাক্ সইবে না আহ্লাদীর মা। গোমরে ফেটে পড়ছিস, চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছিস না, ভগবান এর বিচার করবে···।'

তখন শহরে রাস্তায় রাস্তায় চির-ভিখারী ইতর ছোট জাতের দল বচ্ছরকাব পরবে মদ খেয়ে, সং সেজে, ঢোল বাজিয়ে বিদ্‌ঘুটে চীৎকার করতে করতে গাজন-সন্ন্যাসী সেজে চলেছে।

দুই

কালাচাঁদ বাপের দিলদরিয়া মেজাজটা পেয়েছিল, কিন্তু বাপের টাকাগুলো পায়নি। বাপের ঠনঠনেতে চটিজুতোর দোকান ছিল, নগদ রোজগারও ছিল। তাই এক-মেয়ে পাঁচির বেশ ভাল ঘরেই সে বিয়ে দিয়েছিল দশ বছর বয়সে, আর এক-ছেলে কালাচাঁদকে কোন বায়নায় সে বাধা দেয়নি। কিন্তু বাপ মরবার পর হঠাৎ কোথা দিয়ে দোকান-পত্র সব বেহাত হয়ে গেল কেমন করে, কাঁচাবুদ্ধি কালাচাঁদ কিছুই বুঝতে পারলে না। তার দু-বছর না ঘুরতে ঘুরতেই বোন বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে মার খেয়ে ঘাড়ে এসে চাপল। কালাচাঁদের মোটেই ভাল লাগল না, তবু বোনেরও অকূলে কেউ নেই—যায় কোথা!

কালাচাঁদ ছেলেবেলাটা কাটিয়েছে তার মতো ফচ্‌কে দোস্তদের সঙ্গে রাস্তায় বিড়ি বার্ড্‌সাই খেয়ে, খাইয়ে, চার-আনা-বার-আনা চুল ছেঁটে, আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে, গলায় রুমাল বেঁধে ইয়ার্কিং দিয়ে। বিশ বছর বয়সে বাপ হারিয়ে বোনকে ঘাড়ে করে সে দেখলে এত দিন ধরে শিখেছে শুধু রসাল-রসিকতা করতে, আর ফুটবল খেলোয়াড়দের কুষ্টি নির্ভুল আউড়ে যেতে, রেসের ঘোড়া, জকীয় পরিচয় আর থিয়েটারের সখীদের নাম নিয়ে লাফালাফি করতে। না পারে একটা জুতোর সুকতলা দিতে, না জানে একটা চামড়ার দর করতে।

কুছপরোয়া নেই!

ইয়ার বন্ধুরা বললে, একটা বিড়ির দোকান দে।

ঠিক বাত!

যা-কিছু বাপের নগদ ছিল সব দিয়ে হ্যারিসন রোডের ফ্যাঁকড়া এক গলির ভেতর বিড়ির কারখানা খুলে বসল। বন্ধুরা দরদ করে বিড়ি পাকাতে ও আড্ডা দিতে এসে জুটল, সুতরাং বিড়ির দোকান দু-মাসেই উঠে গেল।

বাপের যে ঘর ছিল তার ভাড়া বেশী। জিনিস-পত্র কতক বিক্রি করে কতক বয়ে এনে কালীঘাটের মুচিপাড়ায় এঁদো পুকুরের পাশে—স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে জল ওঠে—এমন ছুটি কুটরী-ওলা ঘরে এসে ভাই-বোন উঠল।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই, পেট আছে।

ভাই-এর অহরহ মুখনাড়া খেয়েও নিজের গাণ্ডে-পিণ্ডে গেলবার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে না-পেরে, নিজের মাকড়ী বিক্রি করে, তাগা বন্ধক দিয়ে, মরা মায়ের দেওয়া দড়িহারটা পর্যন্ত বাঁধা রেখে পাঁচি বছরখানেক চালালে যা হোক করে। কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলে? অবশেষে যেদিন সব শেষে চাল-ডাল বাড়ন্ত হল, সেদিন সে ভোরবেলা উঠে হাঁড়ি-কলসি নেড়ে আবার বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ময়লা বালিশের ভেতর রুক্ষ চুল সমেত মাথাটা গুঁজে।

কালাচাঁদ হরিনাম কীর্তনী সভায় সারা সকালটা হারমনিয়ম বাজিয়ে গান গেয়ে শ্রান্ত হয়ে দুপুর বেলা ঘরে ঢুকে বললে, 'ভাত বাড় পাঁচি।' তারপর দেওয়ালের পেরেকে টাঙান শিশিটা পেড়ে তাতে এক ফোঁটা তেল নেই দেখে বিরক্ত হয়ে শিশিটা মাটিতে ফেলে তেলচিরকুট ছেঁড়া গামছাটা নিয়ে রুক্ষ মাথাতেই চলে গেল পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসতে।

সংকীর্তনের গানটাই গুণগুণ করে গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে দেখে তখনও ভাত বাড়া হয়নি। চেঁচিয়ে বললে, 'শুনতে পাসনি কালামুখী, কখন যে ভাত বাড়তে বলেছি।' সমস্ত সকাল চেঁচিয়ে ক্ষিদেয় তাব নাড়ী জ্বলে যাচ্ছিল।

পাঁচি বিছানা থেকেই উত্তর দিলে, 'আমি বাঁধতে পারিনি, আমার অসুখ করেছে।

ঠিক দুপুর বেলা, পেট তখন জ্বলছে, কথাগুলো কালাচাঁদের গায়ে আগুবার ছেঁকার মতো ছ্যাক করে উঠল।

দাঁত খিঁচিয়ে সে বললে, রাঁধিসনি কি রকম? ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছি কোন দিন দেখেছ? আমার জ্বর হয়েছে রাঁধতে পারিনি তাই।'

'রাঁধতে পারিনি তাই! আমি খাব কি? কই, তোর জ্বর হয়েছে কি রকম দেখি?'

পাঁচি বিছানার ওধারে আরও সরে গিয়ে বললে, 'না না, দেখতে হবে না, আমার জ্বর হয়নি, যাও।'

'জ্বর হয়নি তবে ন্যাকামি হচ্ছে কেন? রাক্ষসের মতো গিলতে পার তো খুব, ভাত রাঁধতেই গতর নেই! নিজের পেটটি হলেই হল? আমি এখন খাব কি?'

ঠিক দুপুর বেলা ক্ষুধা-কাতর ভাইকে দুটি খেতে দিতে না-পেরে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পাঁচির বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তার যে উপায় নেই; অবুঝ ভাই বোঝে না তো খাওয়াটা কোথা থেকে আসবে! সে চুপ করে রইল তাই।

ভাই শুকনো মুখে না-খেয়ে বেরিয়ে যাবে তাও ভাবতে পারছিল না, অথচ তার সামনে দাঁড়িয়ে গালি-গালাজ করবে তাও সওয়া যায় না।

বোনের কাছে কোন উত্তর না-পেয়ে কালাচাঁদ আরও রেগে উঠে বললে, 'কথা কসনে যে!'—তবুও কোন উত্তর নেই। ক্ষুধা ও রাগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

'রাঁধতে পারিসনি তো বেরো আমার বাড়ি থেকে, এখুনি বেরো। নইলে লাথিয়ে বের করে দেব।'

এইবার পাঁচি কথা বললে, 'বেরুবার জায়গা থাকলে তোমার মতো ভাইয়ের কাছে কেউ পড়ে থাকে না ইচ্ছা করে।'

'তা বল্‌বি বই কি! নেমকহারাম আর কাকে বলে! মুখে পোকা পড়্‌বে পাঁচি, মুখে পোকা পড়্‌বে।'

'ভাই না হলে অমন শাপ আর কে দেবে বল!'

'দেব না শাপ! কেন দেব না শুনি? তুই কি আমার বোন রে রাক্ষসী? বোন হলে ঠিক দুপুর বেলা না খেতে দিয়ে আমায় গালাগালি দিয়ে দূর করে দিতে পারতিস্? দূর তোর ঘর-কন্নার নিকুচি করেছে!'

শেষ কথাগুলো কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে ঘরের কোণের হাঁড়িগুলোয় একটা লাথি মেরে কালাচাঁদ বেরিয়ে যাচ্ছিল। পরের পর সাজান খালি হাঁড়িগুলো কাত্ হয়ে ভেঙে গেল। থমকে সেই ভাঙা খালি হাঁড়িগুলোর দিকে খানিক চেয়ে কালাচাঁদ হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচি লাথির শব্দে চমকে উঠে একবার সেইদিকে চেয়ে একটা উদ্যত প্রতিবাদ দমন করে আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। কান্না চাপবার প্রবল চেষ্টায় তার পাতলা দীর্ঘ দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

*   *   *

সন্ধ্যা হয়ে আসে আসে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ময়লা পুকুর থেকে একটা পচা শ্যাওলার গন্ধ আসছিল রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস ভারি করে। পাঁচি ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে বসল দুঃস্বপ্ন দেখে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে-কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। উস্কো-খুস্কো চুলগুলো মাথার উপর ঝুঁটি করে বাঁধতে বাঁধতে সে উঠে দাঁড়াল।

বাঃ, আচ্ছা মন তো তার! ভাই সকালে না-খেয়ে গিয়েছে, এবেলাও কি খেতে পাবে না নাকি!

ভাঙা হাঁড়িকুঁড়িগুলোর দিকে চোখ পড়ল।

কিন্তু জুটবে কোথা থেকে? পাড়ায় ধার করে আনবে? কোথায়—কার বাড়ি হাত পাতবে? সকলেই তো তারই মতো গরীব? আর ছিদাম মুচির মেয়ে হয়ে সে যাবে হাত পাততে! না খেয়ে মরে যাবে সেও ভাল। কিন্তু না-পাতলেই বা চলবে কেন? কাল যদি-বা যায়, পরশু এমনি করে থাকলে হাত পাততে হবে না? কিন্তু ধার দেবে কে? কনে-বৌ ন্যায্য কথা বলতে পারে, ধার দিতে পারে না। আব কেনই-বা দেবে? সে এ পর্যন্ত কাকে কি দিতে পেরেছে? সেদিন হরির মেয়ে এক ছটাক সরষের তেল চাইতে এসেছিল, ঘরে থাকতেও তাকে বলতে হয়েছিল—নেই। নিজেদেরই এতদিন কি করে চালিয়েছে ভগবান জানেন শুধু। কিন্তু আর বাঁধা দেবার মতোও কিছু নেই।

ভাঙা হাঁড়িগুলোব দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাঁচি খুঁজতে গেল।

কি থাকবে আব? তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে—খোঁজবার মধ্যেও তো ঐ ভাঙা কাঠের বাক্সটি—কিছু পাওয়া গেল না। না, উপায় নেই, উপোস করে থাকতেই হবে। ভাই রাগ করে বেরিয়েছে, হয়তো আজ আর আসবে না; কিন্তু কাল সকালে তো আর আপনি চাল এসে জুটবে না!

হতাশ হয়ে চৌকাঠের উপর গিয়ে পাঁচি বসে পড়ল। পাতিহাঁসগুলো সামনের পুকুরে পাঁকের ভেতর খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওপারে চৌধুরীদের বাড়ির পেছনে সূর্য অস্ত গেছে। আকাশময় সোনালী রং কে লেপে দিয়েছে যেন; বারান্দার কোণে একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে পুকুরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূর—মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বেশ সুন্দর।

ও কি, চোখ মুচছে যে! হ্যাঁ, চোখ মুচছেই তো। তাই তো! অমন রূপ, অমন সাজ পোশাক যার—অমন বড়লোকের মেয়েরও দুঃখ আছে? তারাও কাঁদে?

মেয়েটা চলে গেল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যাচ্ছে না।

ওই কে গান গাচ্ছে না? ওই মেয়েটাই বোধহয়। বেশ গায়। কি গাইছে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে দুটো কথা. 'এস, এস'।

গান থেমে গেল।

বাঃ, খুব মেয়ে তো সে! এই কি গান শোনবার সময়? কিন্তু কি করবে? বাঃ, এতক্ষণ কথাটা মনে হয়নি, আর এমন সোজা কথাটা। তার নিজের হাতে থাকতে সে আকাশ-পাতাল হাতড়ে মরেছে! কিন্তু মাদুলি

কি দেওয়া যায় বন্ধক? শেষকালে মাদুলি বন্ধক দেবে? ঠাকুর-দেবতার জিনিস - আবার কি সর্বনাশ হবে কে জানে—না, না! না খেয়ে শুকিয়ে—দাদা কিন্তু সেই সকাল থেকে না-খেয়ে আছে, আবার রাতে এসেও খেতে পাবে না? ওই দাদা—যে এক দণ্ড স্কিদে চেপে থাকতে পারত না! বাড়ি মাথায় করতো একটু দেরী হলে! সে-ই না খেয়ে আছে, তার ওপর কড়া কথাগুলো শুনে গেছে। খুব বন্ধক দেওয়া যায়, একশ' বার যায়, আর দেবতাই তো নিজে এমন কথা তার মাথায় উদয় করালেন, তা না হলে হঠাৎ তার এমন কথা মনেই বা হবে কেন? ঠিকই তো!

হাতের মাদুলিটা টেনে ছিঁড়তে গেল। পারলে না, দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে পাঁচি বেরুল।

যাক, ভগবান এখন ছুদিনের ভাবনা তবু ঘুচিয়েছেন। আজ বিকালের রান্না এখুনি চাল-ডাল এনে চড়িয়ে দেবে, দাদা এসেই খেতে বসে যাবে।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যা উত্‌রে বেশ একটু রাত হয়েছে। কালাচাঁদ ভেতরে ঢুকে ডাকলে, 'পাঁচি!'

সেইটেই রান্নাঘর, সেইটেই ভাঁড়ার, সেইটেই পাঁচির শোবার ঘর। উনুনের পাশে কেরোসিনের ডিবেতে রোজ আলো জ্বলে। আজ ঘর অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে কিছু দেখতে না-পেয়ে, কোন সাড়া-শব্দও না-পেয়ে, কালাচাঁদ আবার ডাকলে, 'পাঁচি!'

পাঁচি কান্নাগলায় অস্ফুটস্বরে বললে—'কি?'

মাদুলি কেউ বন্ধক রাখতে চায়নি, সকলে বলেছে, বাছা, ঠাকুর-দেবতার জিনিস নিয়ে কি ছেলেখেলা চলে? সত্যি কথাই তো। পাঁচির আগেই একথা ভাবা উচিত ছিল। অন্ধকার ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে পাঁচি সেই কথাই বোধহয় ভাবছিল।

কালাচাঁদ শান্তস্বরে বললে, 'আলো জ্বালিস্‌নি পাঁচি?' পাঁচি অবাক হয়ে গেল, গলায় আদরের আভাস দেখে। কিন্তু ভুল শুনেছে ভেবে আস্তে বললে, 'না, ইচ্ছে হয়নি।'

'তেল আছে?'

পাঁচিকে বলতেই হল 'না।'

কালাচাঁদ অন্ধকারে হাতড়ে কেরোসিনের ডিব্বেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। পাঁচি অবাক হয়ে দাদার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এই সকালে ঝগড়া করে

না-খেয়ে গিয়ে দাদা ফিরে এসে কড়া কথা বললে না, রাগ দেখালে না, খেতে চাইলে না, আবার ডিবে নিয়ে তেল আনতে বেরিয়ে গেল, এর মানে কি? কালাচাঁদ ভিতরে এসে ডিবে জ্বেলে একটু ইতস্তত: করে বললে, 'তোর অসুখ করেছে পাঁচি?'

পাঁচি দস্তুরমতো অবাক হয়ে বললে, 'না, কেন বল তো?'

'না, জিজ্ঞেস করছি যে আজ ভাত রাঁধতে পারবি এবেলা?'

পাঁচি এবার একটু রেগেই বললে, 'কবে আমি ভাত রাঁধতে কাতর হয়েছি দাদা, আর কবেই বা তোমায় তার জন্যে সাধতে হয়েছে, আজ সকালে কেন যে রাঁধতে পারিনি—'

পাঁচির কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই কালাচাঁদ অধীর হয়ে বললে, 'রাগিস কেন পাঁচি? বলছিলুম কি, আজ একটা কাজ পেয়েছি কি না, এই দশ আনা পয়সা আজকের রেখে দে।'

তিন

মুচিপাড়ায় কালাচাঁদের মতো কুড়ে ফুর্তিবাজ আরো থাকলে তিনকড়ির মতো খাটিয়ে কেউ যে নেই, এটা সকলে মানত। সকাল থেকে রাত্তির বারটা পর্যন্ত অমন এক নাগাড়ে গাধার মতো খাটতে কেউ কখন পারে না বলে' মুচিপাড়ার মেয়ে-পুরুষের বিশ্বাস। তবু মুচিপাড়ার মধ্যে যদি কারু সবচেয়ে কাঙালীর হাল থাকে, তবে তিনকড়ির। এ রহস্যের অবশ্য কেউ মীমাংসা করতে পারেনি। তিনকড়ির বৌটা নচ্ছার, একেবারে লক্ষীছাড়া আখখুটে এ আর কে না জানে! তা হলেও তিনকড়িও উপায় করে মন্দ নয়—ভালই করে বলতে হবে, চামড়ার বাক্স তৈরি করে।—তবে ওর ছেলেপুলেগুলোর অমন হাল কেন?

মুচিপাড়ার কারুরি কিছু নেই। কিন্তু না-থাকারও তারতম্য আছে, তা যার অনেক আছে সে বুঝবে না। তিনকড়ি দিনরাত হাড়ভাঙা খাটলেও কেন যে তার ছেলেপুলেগুলো ন্যাংলা কুকুরের অধম হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, তার বৌ-এর হাতে দু'গাছা কেমিকেলের চুড়িও জোটে না ও তার নিজের একদিন এক মুহূর্তের জন্যে একটু ফুর্তি করবার ফুরসৎও থাকে না, এটা একটা সমস্যা বটে। তিনকড়ি তার ছেলেপুলে বৌ নিয়ে কালাচাঁদের ঢের পরে কিছুদিন হল এসেছে; কিন্তু এরমধ্যে সবাই জানে, আহ্লাদীর মা একটা আখখুটে দজ্জাল মাগী, আর তিনকড়ি একটা ধাঁধা!

আহ্লাদীর মা এসে প্রথম ভাব করে পাঁচির সঙ্গে। পাঁচি পুকুরের কোলের জমিটায় চ্যাটাই-এ করে তেঁতুল শুকোতে দিয়ে ঘরের ভিতর গিয়েছিল। হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে নতুন পড়শির নোংরা পেটমোটা ন্যাংটা মেয়েটা আর তার হাড্ডিসার ছোট ভাইটা দুহাতে সেই তেঁতুল তুলে মুখে পুরছে। তিনকড়ির বৌ গোবরের গাদায় বসে তখন ঘুঁটে দেবার যোগাড় করছিল। পাঁচি 'এই!' বলে একটু হাঁক দিতেই সে-ও ফিরে তাকিয়ে ব্যাপার দেখে পাঁচির দিকে একটা ভ্রূকুটি হেনে সেই গোবরলেপা হাতেই ছুটে এসে মেয়েটার হাতটা মচকে ধরে বলছে,—'খেতে পাস না হারামজাদী আঁস্তাকুড়কুড়োনো ছাই-এর তেঁতুলে হাত দিতে গেছো?—তেঁতুল শুকোতে দেবার জায়গাও পায়নি পথের মাঝে কেনা জায়গা পেয়েছে!'

মুখের লালা লাগা তেঁতুলটা মেয়ের হাত থেকে মার হাতের খানিকটা গোবরসমেত তেঁতুলগুলোর ওপর গিয়ে পড়ল। পাঁচি এই অপ্রত্যাশিত, কুঁদুলেপনায় রেগে গিয়ে একটা পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পেট-মোটা মেয়েটা মচকানো হাতের বেদনায় 'উ-হু-উহু' করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার ওপর তার গালে তিনকড়ির বৌ ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলে।

পাঁচি গিয়ে মা-র হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে চ্যাটাই থেকে আরো গোটা কতক তেঁতুল তার ভাইটার হাত দিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে বলল,—'যা এখান থেকে, শীগ্‌গির সরে যা।'

তিনকড়ির বৌ হতভম্ব হয়ে পাঁচির কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তার বয়সে এমন কাণ্ড সে কখনো দেখেনি। লম্বা পাৎলা ছুঁড়িটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

তারপর তাদের ঝগড়া কোঁদল অনেকবার হয়েছে, দিব্যি গেলে মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু টেঁকেনি বেশী দিন। যে মুখরা আহ্লাদীর মাকে পাড়াসুদ্ধ লোক চিনে দূরে রেখে চলত, তার সঙ্গে পাঁচির মতো মুখ-বোজা চাপা মেয়ের গলাগলিও যত আশ্চর্য, ঝগড়াটাও তেমনি অদ্ভুত লাগত সকলের। কালাচাঁদ এখন ষষ্ঠী মিস্ত্রীর সঙ্গে যোগাড়ে হয়ে যা হোক কিছু দিন গেলে কামিয়ে আনে, পাঁচির রাত গেলে সকালে কি করবে তাই ভেবে জেগে আর রাত কাটাতে হয় না। দাদাকে ষষ্ঠী মিস্ত্রী আশ্বাস দিয়েছে শীগ্‌গিরই রাজের কাজে তালিম করে নেবে। পাঁচি এখন মা-র দেওয়া হার চুড়িটা খালাস করবার কথাও ভাবে, দাদার বিয়ে একবার বন্ধক রেখে।

আহ্লাদীর মা-র নিত্যি অভাবে সে যা যখন পারে তাই দিয়ে একটু আধটু সাহায্য করে, আর মনের কথা দুঃখের কথা বলবার এই প্রায়সমবয়সী প্রতি-বেশিনী পেয়ে কাজ-কর্মের অবসরে গল্পগাছাও করে। আহ্লাদীর মা যা-যখন চেয়ে নেয় ধার বলেই নেয়, কিন্তু পাঁচি জানে সে ধার কত শোধ হবে! পাঁচি কিন্তু ঝগড়া হলে মরিয়া হয়ে ধাবের খোঁটাটা মাঝে মাঝে দেয়, না-দিয়ে পারে না।

তিনকড়ি অল্প কথার মানুষ। সাতাশ বছব বয়সে সে বুড়োর মতো গম্ভীব। সে বোধহয় কোন ঝগডায় ধারের খোঁটাটা শুনেছিল। পরবের আগের রাতে বৌকে শুধু তাই বলেছিল,—'কালাচাঁদের বোনের কাছে কিছু নিও না আর। নিজের যা আছে তাতে চালাতে পার ভাল, নইলে উপোস করে থেকো।'

বৌ চটে উঠে জবাব দিয়েছিল—'কে নিতে যায় কে?—ধার মানুষ করে না?'

'যে ধার শোধ করতে পারে না, সে ধাব না-করাই ভাল'—বলে মুখ বুজে পাশ ফিরে সেই যে তিনকড়ি শুয়েছিল, অর্ধেক রাত স্বামীর এ অন্যায় উপদেশের বিরুদ্ধে একলা তর্ক করে গাল দিয়েও তার মুখ থেকে আর-একটা কথাও বার করতে না পেরে আহ্লাদীর মা বেশ চটেই তার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল। মনের রাগটা কারুর ওপব ঝাডতে না পেবে তার দমসম হচ্ছিল। এমন সময় আহ্লাদী আব শশী দাঁত বের করে নাচতে নাচতে সামনে এসে দুটো পয়সা দু'জনে তুলে বললে'—'মাসি দিয়েছে, মা, মাসি পাব্‌‌‌ুনি দিয়েছে, এই দেখ্‌।'—আর যায় কোথায়!

হঠাৎ আনন্দের উচ্ছ্বাসের মাঝখানে অকারণে বিষম দুটো চাপড় খেয়ে তারা দু'জনে অবাক হয়ে কান্না শুরু করে দিলে! 'চুপ কর, ফের ষাঁড়ের মতো গলা বার করছিস?'—বলেই আহ্লাদীর মা দু'জনেব মাথা ঠুকে দিলে।

কিন্তু তাদের গলা পঞ্চম থেকে সপ্তমে উঠল।

ঘর থেকে তাদের কান্না শুনতে পেয়ে পাঁচি ছুটে এসে দু'জনকে কোলের ভিতর টেনে নিয়ে বললে,—'আজ পরবের দিন সকাল বেলাটা আর না ঠ্যাঙালে চলছিল না, না? চল্ রে তোরা আমার ঘরে চল্, মা ভারী বজ্জাৎ।'

ঝট্‌কা মেরে ছেলে-মেয়েকে টেনে নিয়ে আহ্লাদীর মা বললে,—'থাক থাক, ঢের হয়েছে, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না; তোমায় বাপু ভাল কথায় বলে দিচ্ছি, আমার ছেলে-মেয়েকে তুমি আর পয়সা-কড়ি দিও না কখনো।'

পাঁচি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলে-মেয়ে দুটোর হাত দুটো মুচড়ে পয়সা দুটো ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আহ্লাদীর মা বললে,—'নিয়ে যাও তোমার পয়সা, আমরা গরীব আছি, গরীবই থাকব। তোমার পয়সা বেশী থাকে, বিলিয়ে দাও. আমাদের ভিক্ষে দিতে তোমায় ডাকিনি।'

ছেলে-মেয়েগুলো মার খাওয়ার জ্বালার ওপর পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃখে দ্বিগুণ উচ্চৈস্বরে চীৎকার শুরু করে দিলে।

'ভিখিরী দেখলেই মানুষ ভিক্ষে দিয়ে থাকে, না ডাকলেও দিয়ে থাকে'—বলে ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে চেয়ে পাঁচি বেরিয়ে গেল।

এই থেকে ঝগড়ার সূত্রপাত, আর দুপুরে তার পরিণতি।

রাত্তিরে স্ফূর্তি শেষ করে বাইরে সব কথা শুনে এসে কালাচাঁদ বললে বেশ একটু চড়াগলায়, 'ভারি দাতা হয়েছিস পাঁচি। আমি মুখে রক্ত তুলে পয়সা উপায় করে আনছি, আর তুই দানছত্র খুলে বসেছিস্! আমার এত কষ্টের পয়সা নিয়ে অত বড়মানুষী করা চলবে না বাপু, তা বলে দিচ্ছি।'

পাঁচি গম্ভীর স্বরে বললে,—'আমার ভুল হয়েছে দাদা।'

পাঁচি এই সুরে কথা কইলে কালাচাঁদ থই পায় না। সুতরাং গতিক ভাল নয় দেখে সে চুপ করাই যুক্তিযুক্ত ঠিক করলে।

চার

ভাল করে ভোর না হতেই কনে-বৌ দরজার কাছে এসে ডাকলে 'ও পাঁচি, ঘুমোচ্ছিস বোন? দরজাটা একবার খোল না।'

পাঁচি ঘরের ভেতর থেকে বললে, 'দরজা খোলাই আছে এস।'

নীচু অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একটা ছোট কুটুরী; ওপরে পাতার চাল; অন্ধকার না হলে দেখা যেত উনুনের ধোঁয়ার ঝুলে কালো হয়ে গেছে—অনেক গরুর গোয়ালও এর চেয়ে ঢের ভাল। তার একধারে আর-একটা দরজা বন্ধ ছিল, সেটা দিয়ে কালাচাঁদের ঘরে যাওয়া যায়। দরজাটা এত অপরিসর ও নীচু যে কোন সুস্থ-সবল লোকের তার ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা নির্যাতন বিশেষ। সৌভাগ্যক্রমে যাদের এর ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, তারা দু-এর কোনটাই নয়—অন্নাভাবে, অতিশ্রমে ও অত্যাচারে।

কনে-বৌ ঘরের ভেতর ঢুকে বললে, 'কাল এত কাণ্ড হয়ে গেছে বোন আর কিছু টের পাইনি। যত বয়স বাড়ছে তত মড়ার মতো ঘুম হচ্ছে। কিন্তু ধন্যি মেয়ে তুই বাবা! তুই না থাকলে কাল কি সর্বনাশ হত বল তো!'

পাঁচি কাঁথাটা গায়ে দিয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল, কথা কইলে না!

'তুই বুঝি আগেই দেখতে পেয়েছিলি? তখন কত রাত হবে?—প্রায় তিন প্রহর, না?'

'হ্যাঁ।'

'আগুন দেখেই তুই বুঝি ছুটে গেছলি? অত বড় মিন্‌সেকে আগুনের ভেতর থেকে টেনে বার করে আনলি···তোর ক্ষমতাও তো কম নয় পাঁচি! সবাই ধন্যি ধন্যি করছে। তুই অত আগে না চেঁচিয়ে ডাকলে কি আর ও-আগুন নেবান যেত, সব ছার-খার হয়ে যেত!'

'তুমি কোথায় শুনলে?'

'কোথায় আবার শুনব! পাড়াসুদ্ধ লোকেই তো জানে। তিনকড়ি হাতের জ্বালায় একবার করে কাতরাচ্ছে আর বলছে,···"সে না থাকলে আমায় আজ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হত"।'

পাঁচি কি-একটা জিজ্ঞেস করবে ভেবে খানিক ইতস্তত করে শেষে চুপ করেই রইল।

কনে-বৌ বলে যেতে লাগল, 'আমি তা হলে ন্যায্য কথা বলি বাপু, ও ছোঁড়ারই বা কি রকম একগুঁয়ে খেয়াল। সমস্ত দিন খেটে আবার অত রাত পর্যন্ত কাজ করতে সব্বাই মানা করেছে, আমি কতবার বলেছি শরীরটাকে অমন করে মাটি করিসনি তিনকড়ি, তা কে কার কথা শোনে! অত রাত পর্যন্ত নাগাড়ে কাজ করলে মানুষের ঘুম পায় না? ওই ঢলে পড়েছিলি অজান্তে, যদি ডিবের তেলটা গড়িয়ে ওদিকে না গিয়ে তোর মাথার দিকে পড়ত? তোর নেহাৎ ভাগ্যি তাই কেউ দেখতে পেয়েছিল, যদি না পেত—'

পাঁচি অজান্তে একবার শিউরে উঠল কাঁথার মধ্যে।

'তা হলে কি হত? আর তুই যে ঘানির গরুর অধম হয়ে খেটে মরছিস—কি লাভটা হচ্ছে শুনি? যে হাঁড়ির হাল সেই হাঁড়ির হালই তো আছে! পেটে খেতে পাস না ভাল করে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করার অব্‌কেশ নেই, ছেলে-পুলেগুলো ন্যাং ন্যাং করে বেড়াচ্ছে—কি জানি বাপু!'

পাঁচির কালকের ধোঁয়া-আগুনের আঁচ লেগে বুঝি চোখটা এমন করকর করছিল, এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

'আমি তা হলে নেয্য কথা বলি-বাপু, ঐ বৌটা একেবারে আখ্যুটে; তা না হলে ওদের অমন দশা হয়। বলিস কি পাঁচি?—সোয়ামীকে একটু ছেদ্দা-যত্ন করে না। খেটে খেটে হাড়-মাস ক্ষ্যায় করে ফেলেছে তা একটু দেখে না।

তিনকড়ি যা উপায় করে' তাতে ওর মতো দুটো সংসার ভাল করে চলে যাবে। আমরা কি আর সংসার করিনি—না জানিনি। এই তো তুই আছিস পাঁচি, আমি সকলকে বলে বেড়াই—পাঁচির মতো মেয়ে এ পাড়া খুঁজলে পাবে না, কি গুছিয়ে সংসার করবে! দেখে আহ্লাদ হয়। ও তো আর মুচির মেয়ে নয়! বামুন-কায়েতের মেয়ে শাপভেরষ্‌টা হয়ে এসে জন্মেছে।'

পাঁচি চুপ করে রইল।

'তা কি বলছিলুম জানিস পাঁচি? চৌধুরী-গিন্নি বাপের বাড়ি গেছে কি না, তিন দিন বাদে বলেছে ঘুঁটের দামটা দিয়ে দেবে। তা আমি পেলেই দিয়ে দেব, দেখিস—ঠিক দিয়ে দেব! আমায় তিন আনা পয়সা ধার দিতে পারিস?'

'পয়সা তো নেই দিদি! দাদার দশ দিনের রোজ আটকে পড়ে আছে এখনো পায়নি। আমাব হাতে একটি পয়সাও নেই।'

'না হয় এক আনাই দে বোন, আজকেব দিনটা গেলে কাল যা হয় দেখা যাবে।'

'সত্যি দিদি, মাইবি বলছি একটা পয়সাও নেই—না হলে দিতুম।'

'দেখি তবে, আর কোথায় পাই কি না,—বলে এই অহঙ্কারী মেয়েটাকে মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তে কনে-বৌ দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

পাঁচি উঠল। পুকুবে বড কেউ নেই। সেই ঘোলাটে শ্যাওলা-পচা গন্ধভরা জলে মুখ ধুয়ে রাঁধবার জল তুলে আনলে। মুচিপাড়ায় পাঁচি বোধহয় একটু পরিষ্কাব! উন্নুনটা ন্যাতা ভিজিয়ে নিকোল, একটা পাতলা কাঁসার থালায় ক'রে বর্মাব মোটা চাল ধুলে, তারপব নিজের দেওয়া ঘুঁটে বাডির পেছনেব চাল থেকে তুলে এনে চ্যালাকাঠ কাটাবি দিয়ে কেটে আগুন দিয়ে ভাত চডিয়ে দিলে। দিয়ে, কুটনো কুটতে রাখলো দুটো আলু একটা শুঁকটো বেগুন। কালাচাঁদ গত রাত্রের হাঙ্গামায় অনেক রাতে শুতে গেছল। একটু বেলা করে উঠল; দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই লজ্জায় কালো হয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

পাচি তখন দাঁড়িয়ে ভাতের হাঁড়ি নামাচ্ছিল। দাদার দরজা খোলার শব্দ সে পেয়েছিল, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল,—আজ ডাল রাঁধবে, না আলু-বেগুনের তরকারী হলে হবে?—হঠাৎ দাদার লজ্জায় কালো হয়ে মুখ ফিরিয়ে ঘরে ঢুকে যাওয়ায় চমকে দেখলে—ছি! ছি! ছি! ছি!

ভাতের হাঁড়িটা সশব্দে আর পায়ের বুড়ো আঙুলটা থেৎলে পড়ে চুরমার হয়ে গেল! গরম ফুটন্ত জলে ভাতে তার পায়ে ছেঁকা দিয়ে দিলে। নীচু হ'য়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে সে কোমরে জড়িয়ে সেইখানেই বসে পড়ল। হা ভগবান! কালকের আগুন লাগার হট্টগোল—ছুটোছুটি,—টানাটানির মাঝে পচা-গলা কাপড়খানির খানিকটা পুড়ে গেছে, আর পেছনের খানিকটা কিসে লেগে এমনভাবে ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে যে নারীর তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না—মুচির মেয়েরও না। তখন গোলমালে লক্ষ্য করেনি, সকালে উঠেও সেদিকে নজর পড়েনি। আর এই কাপড় নিয়ে এতক্ষণ সে পুকুরে গিয়ে মুখ ধুয়েছে, জল এনেছে, ঘুঁটে এনেছে! কিন্তু এই বই আর তার কাপড় নেই যে! এই পচাগলা কাপড়টি শীঘ্রই অকেজো হয়ে পড়বে জেনেই সে ক'দিন দাদাকে কাপড় আনতে বলেছিল, কিন্তু দাদাও তো রোজ পাচ্ছে না ক'দিন ধরে! আনছে-আনবে করে আর আনা হয়নি। হায়! মুচির মেয়েও যে মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যে না খেয়ে মরে যেতে পারে, তবু তারা লজ্জার লাঞ্ছনা সইতে পারে না। কিন্তু কি ঘেন্না! পাচি অভিভূতের মতো চুপ করে বসে রইল। কাপড় না হয় আর একটা থাকতে নেই, কিন্তু তাই বলে সে আগে থাকতে টের পায়নি কেন? আর কেউ যদি দেখে থাকে! যত ভাবছিল তত তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। তার চাপা কান্না তার গলার গোড়ায় লোহার ডেলার মতো ঠেলে উঠছিল। কেন? কি পাপে তার এমন লাঞ্ছনা?

নারীর শুধু দু'দণ্ডের শৌখীন খেয়াল মেটাতে কোটি কোটি প্রাণী জীবনের অপূর্ণ প্রভাতে অন্ধকারে অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, স্তূপাকার বসন-ভূষণের আয়োজন—কোটি মানুষের রক্ত-জলকরা শ্রমের সাফল্য—মুহূর্তের আনন্দ দিয়ে অনাদৃত পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই নারীরই মাত্র লজ্জা নিবারণের জন্যে একখানি পচা ময়লা পুরনো কাপড় বই জোটে না।

কিন্তু এখন সে উঠবে কি করে এখান থেকে! ভাত তো নষ্ট হয়েই গেছে! যাক, কিন্তু রাঁধবে আবার কি করে?

কালাচাঁদ ঘরের ভেতর ঢুকে ভাতের হাঁড়ি পড়ার শব্দ শুনে বাইরে পাঁচির অবস্থাটা অনেকটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু কি করবে তা ঠিক পারছিল না। সে তো জানে দুটি বই আর কাপড় নেই ঘরে। যা রোজ পায় তাতে ঘর-ভাড়া দিয়ে খেয়ে-দেয়েই কুলিয়ে উঠতে পারা যায় না। তা থেকেই কিছু বাঁচিয়ে অনেকদিন থেকেই ভেবেছিল একটা কাপড় কিনে আনবে! কিন্তু সে তো আনা হয়নি। এখন উপায় কি!

উপায় হল। পাঁচি চুপ করে বসে নষ্ট ভাতগুলোর দিকে করুণচোখে চেয়ে ছিল। কতকগুলো কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে; অন্যগুলো আবার ধুয়ে যাহোক করে খাওয়া যাবে, কিন্তু—

হঠাৎ কালাচাঁদ নিজের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে হাত দিয়ে কাপড়খানা বাইরে ফেলে দিয়ে বললে, 'আমার কাপড়টা কেচে দিস তো পাঁচি। এখন আর আমায় ভাত না হলে ডাকিসনি!—কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি, একটু ঘুমবো।' তারপর সশব্দে দরজার হুড়কো দিয়ে দিলে।

পাঁচ

পা দুটোয় কে যেন দু-মণ লোহা চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু না উঠলে তো চলবে না। উঠে সেই কাপড পরতে হল। তারপর চরণের বৌ-এর কাছ থেকে গিয়ে ছুঁচ-সুতো চেয়ে এনে পাঁচি প্রথম নিজের কাপড়খানা যাহোক করে শেলাই করতে বসল। কিন্তু সে পচা কাপড কি শেলাই হয়? শেলায়ের টানেই সুতো তার ছিঁড়ে যায়! তবু একদিনের মতো চলনসই সেটাকে পাঁচি করে নিলে, তারপর রান্নার যোগাড় করতে গেল। দাদার মতো ভাত যা পড়ে গেছল তাই ধুয়েই হবে, সুতরাং আলুবেগুনের একটা তরকারী চাপিয়ে দিলে।

রান্না হয়ে গেলে থালায় ভাত-তরকারী বেড়ে দিয়ে পাঁচি নিজের কাপড়টি পরে দাদার কাপড়টা রেখে দিলে। তারপর 'তোমার ভাত বাড়া হয়েছে উঠে যাও, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি'—বলে দাদাকে ডেকে দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে ফিরে এসে দাদার ভাতের থালার সামনে বসে একটু ইতস্তত: করে বললে, 'আজ কি টাকা ক'টা পাবে দাদা?'

'হ্যাঁ, আজ তো দেবার কথা, এ মাসের ঘরভাড়া আর দিতে পারা গেল না বোধহয়, একটা কাপড় কিনতে হবে।'

তারপর আর কেউ কোন কথা বললে না।

কালাচাঁদ গলি দিয়ে বেরুতেই দেখলে সামনে একপাল ছেলে বাঁকাবুড়ির পেছনে লেগেছে। সে-ও উচ্চৈঃস্বরে তাদের পিতৃ-মাতৃ-কুলের উপাদেয় নানা ভোজের বন্দোবস্ত করতে করতে বাঁকা পা-দু'খানি থপ্‌থপ্‌ করে ফেলে কদাকার কচ্ছপের মতো এগিয়ে আসছে। যাবার পথেই এই কদাকার অষ্টাবক্র মাগীটাকে দেখে তার মনটা অজান্তে বিরক্ত হয়ে উঠল। ছেলের পাল তখন শুধু 'বাঁকা বুড়ি-গো!' বলে চেঁচিয়ে তাকে ক্ষেপিয়ে মারছে। শেষে আনন্দ

না পেয়ে তাকে ঢিলোতে শুরু করেছে, আর এই হৃদয়হীন অত্যাচারের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন পথ না দেখে হতভম্ব নির্বোধ প্রাণীটা স্তিমিত দু-চোখে জল নিয়ে একমাত্র উপায় গালাগাল অবলম্বন করে কাতরভাবে চীৎকার করছে শুধু।

কাজের জায়গায় গিয়ে কালাচাঁদ মিস্ত্রীকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলে, 'আজ তারা সব রোজ চুকিয়ে দেবে তো?'

'দেবে না! আজ না দিলে আমার আর চলবে না। না, তারা সে-রকম লোক নয়, দেনা-পাওনা হিসেবে খুব সাচ্চা।—ওরে কালাচাঁদ, তোর নসীব ভাল, একটা কাজ ঠিক করেছি তোর—বার আনা করে এবার থেকে রোজ!' বলে ষষ্ঠী মিস্ত্রী কালাচাঁদের পিঠটায় একটা চাপড় দিয়ে উৎসাহ দিলে।

কালাচাঁদ মনের আনন্দটা চেপে বললে, 'কিন্তু আজ ভাই আমার কিছু টাকা চাই-ই—'

'সে হবে রে হবে! এখন থেকে তুই রাজ হতে চললি, আবার টাকার ভাবনা?' বলে ষষ্ঠী এক চোখ মটকে ইশারা করে হাসলে।

বড়লোকের নতুন বার-বাড়ি মেরামত হচ্ছিল। ষষ্ঠী, কালাচাঁদ, নেত্য বলে আর-একটা মেয়েমানুষ-যোগাড়ে, আর শিবু মিস্ত্রীই আগাগোড়া করে এসেছে। কালাচাঁদের প্রথমে মুচির ছেলে হয়ে জাতব্যবসা ছেড়ে রাজের যোগাড়েগিরি করতে বিশেষ লজ্জা হয়েছিল, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও যে নেই। কালাচাঁদ অন্যদিন কাজ করতে করতে নেত্যর সঙ্গে একটু-আধটু রসিকতা করে, স্ফূর্তি করে, ফষ্টিনষ্টি করে নেত্যকে রাগিয়ে আর সকলকে হাসায়, আজ কিন্তু তার বাড়ির কথা মনে হয়ে কিছু ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল টাকাটা পেয়ে কাপড় কিনে বাড়ি গেলে তবে তার স্বস্তি হবে।

বাড়ির কর্তার দৃঢ় বিশ্বাস ছোটলোক সব বেটা জোচ্চোর, একটু নজর না দিলেই ফাঁকি দেবে, বেটাদের ধর্মজ্ঞান মোটেই নেই। তাই তিনি অধর্মকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য অহরহ হয় নিজে নয় ছেলেপুলে কাউকে দিয়ে চৌকি দিতেন, আর পাজি ছোটলোকগুলোও এই সতর্কতা ব্যর্থ করে ফাঁকি দিয়ে বাহাদুরী করত—যতখানি পারত। দু-পয়সার জিনিস এনে বলত তিন পয়সার, পাঁচ মিনিটের কাজে কাটিয়ে দিত পোনের মিনিট।

বিকেল বেলা কাজ শেষ হয়ে এসেছে। কালাচাঁদের তখন আর কোন কাজ ছিল না, সে চুপ করে বসেছিল। বাড়ির কর্তা বসে থাকা দেখতে পারতেন না, পুরো রোজ দিয়ে পুরো কাজ আদায় করা তাঁর মত। তিনি

কালাচাঁদকে একটা ফরমাশ করে বসলেন। সময় প্রায় হয়ে এসেছিল, সুতরাং কালাচাঁদ একটু আপত্তি করলে—কিন্তু অন্যায় আপত্তি খাটবে কেন? তিনি যুক্তি দিলেন, দশ আনার জায়গায় সাড়ে-ন-আনা হলে যখন সে সন্তুষ্ট হয় না তখন তিনি কোন্ হিসাবে সময় নষ্ট করতে দেবেন তাকে? বিরক্ত হয়ে কালাচাঁদ উঠল, অগত্যা কর্তার আদেশ মতো নতুন ঘরে আসবাব-পত্র গুছোতে গেল।

সময় হয়ে গেছে। বাইরে ষষ্ঠী ময়লা চাদরটা দিয়ে গায়ের চুন-ধুলো ঝাডতে ঝাড়তে ডাকলে—'কালাচাঁদ!' কালাচাঁদ বিরক্ত হয়ে চেয়ারের উপর উঠে ছবিটা টাঙাচ্ছিল। এ ডাকে একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পেছনেব দডিটা ভাল করে বুঝি পেরেকে লাগেনি। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে ছবিটা মাটিতে পড়ে দামী কাঁচখানা চুরমার হয়ে গেল। ভাঙা কাঁচের টুকবোয় ছবিটাও বহু জায়গায় গেল ছিঁড়ে।

হাঁ হাঁ করে কর্তা ছুটে এলেন আর সকলেও এল শব্দ শুনে। এসে দেখে, বিমর্ষ হতভম্ব মুখে কালাচাঁদ দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের ওপর।

'দেখলে, বদমায়েশী দেখলে!'—কর্তা রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। 'জুতিয়ে তোমার খাল খেঁচে দেব শুয়ার, পেজোমী করবার আর জায়গা পাওনি!'

ষষ্ঠী মিনতি করে বললে—'দেখতে পায়নি হুজুর অসাবধানে পড়ে গেছে।'

তাকে এক ধমক দিয়ে কর্তা বললেন—'দেখতে পায়নি! ন্যাকামো! কাজ করতে এসেছেন, দেখতে পান না চোখে!—নাব বেটা – নাব চেয়ার থেকে! আমার অত দামের ছবি নষ্ট করেছিস, তোকে আমি পুলিসে দেব হারামজাদা কোথাকার!'

চেয়ার থেকে নামতে মেঝের একটা কাঁচ ফুটে গেল পায়ে। সেটা বার করতেই ভলভল করে রক্ত বেরুতে লাগল। হারামজাদা শুনেই কাঁলাচাঁদ কিন্তু পায়ের রক্ত ভুলে বলে উঠল—'গালাগাল দিও না বলছি বাবু!'

'ছবি ভেঙে আবার রোক করবি তো মুখ থেঁতো করে দেব বেটা!—আ মোলো—আস্পর্ধা দেখো!'

ষষ্ঠী ইত্যাদি সকলে একসঙ্গে বলে উঠল,—'আরে চুপ চুপ, হুজুর রাগ করেছেন এখন কথা কইতে আছে বোকা কোথাকার!'

কর্তা এবার ষষ্ঠীর দিকে ফিরে বললেন—'কে তোমায় এমন বদমায়েশ লোক আনতে বলেছিল? কেন তুমি এমন লোক এনেছিলে? আমি তোমার পাওনা থেকে ছবির দাম কাটব! আমি তো ওকে চিনি না, আমি তোমায় চিনি।'

ষষ্ঠী ভয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে বললে—'দোহাই হুজুর, গরীবকে মারবেন না। ও নতুন লোক—এমন বদমায়েশী করবে জানলে আমি আনতুম না। কাজের জন্যে আমায় পেড়াপীড়ি কচ্ছিল বড্ড, তাই এনেছিলুম হুজুর!'

প্রবলের অত্যাচারের ভয়ের মুখে বন্ধুত্বের সমস্ত সম্মান মর্যাদা ভেসে গেল।

কর্তা এই মাথানোয়ানো কাকুতিতে মনে মনে খুশী হয়ে বাইরে কঠোর ভাব দেখিয়ে বললেন, 'তুমি ও-রকম লোক আর আনবে না। আর আমি ওকে এক পয়সা মজুরী দেব না। যে ছবি ও নষ্ট করেছে, ও ছবির দাম পাঁচ শ' টাকা!—একটি পয়সা আমি দেব না।'

ষষ্ঠী হাত জোড় করে বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

কালাচাঁদ হতভম্ভ হয়ে এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার মজুরী না পাবার সম্ভাবনায় মরিয়া হয়ে বললে—'বা, আমার মজুরী পাব না কি রকম?'

'ফের কথা কইছিস, বেটা পাজী নচ্ছার কোথাকার! তোকে পুলিসে দিচ্ছিনে এই তোর বাবার ভাগ্যি, জানিস?'

ভেতরে কালাচাঁদের কান্না ঠেলে উঠছিল—সে সেটাকে প্রাণপণে চেপে বললে—'হ্যাঁ পুলিসে দেবে! অমনি আর কি? আমার মজুরী দিয়ে যাও বাবু!'

কর্তা এই অসভ্য ছোটলোকটার সাহস দেখে অবাক হয়ে চীৎকার করে বললে—'তবু তুই কথা কইছিস বদমাশ! দেব না—এক আধলা দেব না, যা তুই, যে করে পারিস আদায় করে নিগে যা!'

কোন কথা খুঁজে না-পেয়ে কালাচাঁদ পাগলের মতো শুধু বললে—'হ্যাঁ, দেবে না বৈ-কি! দেবে না বৈ-কি। আমার হকের মজুরী দেবে না বৈ-কি!'

এবারে কর্তার বোধহয় অসহ্য হল, বললে,—'বেরো, আমার বাড়ি থেকে,—দরওয়ান! দরওয়ান!' কর্তা রাগে কাঁপছিলেন।

আর দরওয়ান ডাকতে হল না, ষষ্ঠী শিবুরাই টেনে হিঁচড়ে অনিচ্ছুক কালাচাঁদকে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে গেল। কালাচাঁদ হাত-পা ছুঁড়ে বাজে বকতে বকতে তাদের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাইরে যেতে বাধ্য হল। শুধু এই অন্যায় অত্যাচারের সামনে নীচু হয়ে কেঁদে ফেলে ভিক্ষে চেয়ে বলতে পারলে না, কেন তার মজুরীর আজ সবচেয়ে বেশী দরকার। বলতে পারলে না, তার বোনের যে লজ্জা-নিবারণের কাপড় নেই। দুটি চাল বিনা তার ঘরে যে হাঁড়ি চড়বে না কাল।

ছয়

কালাচাঁদকে বাইরে বার করে এনে সকলে একসঙ্গে তাকে বোঝাতে চলল, দামী ছবিটা ভেঙে ফেলে অত তেজ দেখানো তোর মোটেই উচিত হয়নি। বড়লোক ওরা ও-রকম অপমান করলে চটে যাবে না? ওরা যদি মজুরী না দেয় কি করতে পারে সে! তার চেয়ে নীচু হয়ে গেলে হয়তো বাবু নরম হতে পারত। আর একটু হলে সে তাদের পর্যন্তও তো ফাঁসিয়েছিল। ষষ্ঠী বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিতে দিতে চলছিল, বলছিল—'ও-রকম তেজ নিয়ে পয়সা উপায় করা চলে না কালাচাঁদ, আমাদেরও যখন রক্ত গরম ছিল তখন আমাদেরও অমন তেজ ঢের ছিল, কিন্তু অনেক ঠেকে শিখেছি বাপধন, তেজ করলে তেজ নিয়েই থাকতে হয়, পেটে ভাত জোটে না। বাবুদের মর্জি বুঝে যদি না চলতে শেখ তাহলে কোনকালে কিচ্ছু হবে না! আর তুমি তো বাপু সত্যিই ছবিটা ভেঙে ফেলেছ। বাবু ভাল লোক তাই অমনি রেহাই দিয়েছে, নইলে আজ পিঠের চামড়ায় দাগ নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হত! কি করতে তুমি বাপু? বড়লোকের সঙ্গে পারতে? আমার সঙ্গে যদি কাজ করতে চাও ও-সব তেজ-ফেজ ছেড়ে দিতে হবে বাপু।'

শিবু বললে, 'কাঁসারিপাড়ার বাবুর কথা মনে আছে ষষ্ঠী? কি মার খেলে সত্য! তারপর নালিশ করে আদালতে কি নাকালটা হল। আবার তো সেই বাবুর হাতে-পায়ে ধরে তবে রেহাই পায়!'

কালাচাঁদ এদের অর্ধেক কথা শুনতে পাচ্ছিল না। সে মুখ গোঁজ করে আপন মনে চলছিল। ছবি ভাঙবার দুর্ভাগ্যের পর এই যে কেলেঙ্কারীটা হয়ে গেল তাতে তার দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে মাথার যেন ঠিক ছিল না। পেছন থেকে সাইকেলের বেলের আওয়াজ তাই সে শুনতে পায়নি।

'এইও শুয়ার—স্টুপিড্!' সঙ্গে সঙ্গে সজোরে এসে সাইকেলের চাকাটা তার কোমরে লাগল। ভদ্রলোকটি সাইকেল সামলাতে না পেরে কাৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

কোমরে বিষম ঘা খেয়ে চমকে পেছনে ফিরে সাইকেল-আরোহীকে দেখতে পেয়ে কালাচাঁদ রুখে উঠে আপনা থেকেই বলে ফেললে, 'কানা হয়ে সাইকেল চালাচ্ছ, দেখতে পাও না শালা!'

দীর্ঘায়তন, বলিষ্ঠ, সুন্দর ভদ্রলোকটির মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠল। রাস্তার অনেকে তখন মজা দেখতে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।—'কি বললি স্টুপিড, রাস্কেল?'—বলে ভদ্রলোকটি এগিয়ে গেলেন।

কালাচাঁদের তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে! বললে, 'ভারি আমার নবাব সাইকেল-চালানেওয়ালা এসেছেন। মারবে নাকি?'

ভদ্রলোক একটা কালো ইতর শুকনো মজুরের এত আস্পর্ধা সইতে পারলেন না. সাইকেলটা ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার গলাটা ধরতে গেলেন। সকলে একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলে। ষষ্ঠী, শিবু কালাচাঁদের এই নতুন বেয়াদবী দেখে বিরক্ত হয়ে তাকে আগে থাকতে টেনে ভিড় থেকে বার করে দিয়ে পথে এগিয়ে দিলে। আরেকজন ভদ্রলোক সাইকেল-আরোহীকে আটকে বললেন, 'আরে মশাই, করেন কি, করেন কি—ছোটলোকের সঙ্গে মারামারি করতে যাচ্ছেন?'

তিনি হাত দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে বলেন, 'ছেড়ে দিন মশাই, আই শ্যাল্ টীচ্ হিম্ এ গুড্ লেসন।'

'আরে মশাই, ছোটলোকের গায়ে হাত তুলে নিজের মানটা খোয়াতে যাচ্ছেন!'—সমবেত সকলেই ভদ্রলোকের যুক্তিযুক্ত কথায় সায় দিলে। ছোটলোককে মেরে শিক্ষা দিতে হলেও যে তাকে কিছু সম্মান দিতে হয়! ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে কি লাভ? ভদ্রলোকের হাতে মার খাবার উপযুক্ত সম্মানও যে ছোটলোক দাবী করতে পারে না।

তখন আর একদল ছোটলোক কালাচাঁদের চারধারে ভিড় করে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে যেতে তিরস্কার করছিল—'ছোঁড়া ভারি বদমাশ তো!'

'ভদ্রলোক তো পা-গাড়ির ঘণ্টি দিয়েছিল—শুনতে না-পেয়ে আবার গালাগাল! আমরা না থাকলে মার খেয়ে মরত!'

'ফুটানি করবার আর জায়গা পায়নি!'

'তেল হয়েছে তোমার বড়, না? তেল বেরিয়ে যেত!'

'লৌণ্ডা মাতোয়ালা হ্যায়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাইকেল-আরোহী ভদ্রলোক তখন উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, 'আপনারা ছাড়লেন না, ভাল হল না, কিন্তু বেটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার ছিল। ছোটলোকের আস্পর্ধা আজকাল ভয়ানক বেড়েছে। দেখুন না মশাই, বেল দিলুম তবু বেটা নড়ে না, আবার গালাগাল—আই অট্ টু হ্যাভ্ গিভ্ন হিম এ গুড লিকিং—তাহলেই ঠাণ্ডা হয়ে যেত!'

ছোটলোকের আস্পর্ধা ভয়ানক বেড়েছে এ-বিষয়ে একমত হলেও তাদের ধরে মারতে গেলে আত্মসম্মান হারানো হয় কি না এ-বিষয়ে আলোচনা করতে করতে জটলা ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছিল।

কালাচাঁদকে বাড়ির পথে এগিয়ে দিয়ে ষষ্ঠী শিবু নেত্য নিজেদের আড্ডার পানে গেল।

ষষ্ঠীও যখন নিজের বাড়ি চলে গেল তখন নেত্যকে একলা পেয়ে একটু ব্যঙ্গ করে শিবু বললে, 'দেখলি নেত্য, কালাচাঁদের হামবড়ামির ফল দেখলি? বড় চাল দেখায়, চাল বেরিয়ে গেছে।' তারপর কালাচাঁদের লাঞ্ছনার কথা ভেবে হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কপালে-মুখে উল্কি-কাটা চোয়াড়ে-গাল মেয়েটা ভ্রূকুটি করে শুধু বললে, 'যাও যাও, তোমাদের মুরোদ বোঝা গেলে—নেভি কুত্তার দল!'

সাত

কালাচাঁদ যখন সমস্ত দিনের বিশ্রী বিশ্রী ব্যাপারগুলো ভাবতে ভাবতে মনমরা ও অবসন্ন হ'য়ে ঘরে ফিরছিল, তখন সন্ধ্যার আকাশ কালো মেঘে জমকালো হ'য়ে উঠেছে। ঘরেব চৌকাঠে পা দিয়েই দেখে সেই বাঁকাবুড়ীটা বসে পাঁচির সঙ্গে গল্প করছে। এক পলে তার সমস্ত দিনের দুর্ভাগ্য লাঞ্ছনার কারণ এই কদাকার অপয়া বুড়ীটাকেই মনে করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। বাঁকাবুড়ী তখন পাঁচির কাছে বসে নিজের দুঃখ জানাচ্ছিল, কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের ঢিল লেগে যে সব জায়গা ফুলে উঠেছিল তাই দেখিয়ে আঁটকুড়ির পুতদের সদ্য মরণ কামনা করছিল।

'বেরো মাগী, বেরো আমার বাড়ি থেকে—এখানে তোর কি দরকার?' অকস্মাৎ হুঙ্কার শুনে তারা দুজনেই চমকে উঠে অবাক হয়ে কালাচাঁদের দিকে চেয়ে রইল। জোরে মাটিতে পা ঠুকে কালাচাঁদ বললে, 'আভি নিকালো।'

বাঁকাবুড়ী হতভম্ব হয়ে বললে, 'কেন গো? কি করনু আমি?'

কালাচাঁদ অধীর হয়ে চীৎকার করে বললে, 'আমার চোখের সামনে থেকে শীগ্‌গির সরে যা অপয়া মাগী। কি করতে মরতে এখানে এসেছিস?'

কালাচাঁদের রুদ্র মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বুড়ী বললে 'ঘাট হয়েছে বাবা, কিন্তু দোহাই ভগবান, কোন অপরাধ করিনি—'

এখানে বক্ বক্ করলে ভাল হবে না বলছি মাগী!' বলে আর এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে কালাচাঁদ ঝনাৎ করে শিকলটা খুলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

পাঁচি দাদার বেয়াড়া রাগের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল; এইবার বললে, 'ও তোমার কি ক্ষতি করেছিল যে বিনাদোষে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে?'

কালাচাঁদ ঘরের ভিতর থেকে উত্তর দিলে, 'আমার খুশি।'

'মিছিমিছি একটা অনাথ অথর্ব বুড়ো মানুষের মনে অমন করে কষ্ট দিলে কখ্‌খনো ভাল হয় না।'

তারপর খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। মেঘ করে থাকায় অসময়েই ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাঁচি বললে, 'আমার কাপড় এনেছ তো?' কালাচাঁদ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল, আস্তে উত্তর দিলে 'না।'

'বাঃ, কাপড় আনোনি কি রকম?'

'আনিনি; আবার কি রকম?'

বাঃ, আমি কি পরব?'

'জানি না আমি।'

এবার পাঁচির ভারি রাগ হল; বললে, 'জানি না বললেই হল? মজুরীর টাকাগুলো নিয়ে ফুর্তি করে এলে আর বোনের কাপড় আনবার কথাটা মনেই রইল না। বাঁদির অধম হয়ে খাটব আমি, আর একটা কাপড় দেবার বেলায় তুমি বলবে জানি না?—বেশ!'

'কে তোকে বাঁদির অধম হয়ে খাটতে বলছে? না পারিস দূর হয়ে যা না, আমার আপদ যায়!'

'যাবার কোন চুলো নেই দাদা, নইলে উঠতে-বসতে তোমার মুখনাড়া খেয়ে এক মুঠো ভাতের জন্যে পড়ে থাকতুম না। মুখপোড়া যমও যে ভুলে আছে!'

পাঁচি আর কান্না চাপতে পারলে না। দুটো হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল।

সমস্ত দিন যত অন্যায় অপমান লাঞ্ছনা সয়েছিল তার জ্বালা যেন কালাচাঁদের মুখ দিয়ে এমনি করে বিষ হয়ে বার হয়ে যাচ্ছিল। তাই তার একমাত্র স্নেহের পাত্রী এই নির্দোষ, জন্মদুখিনী, অক্লান্ত সেবারতা ছোট বোনটির সমস্ত কাতর কান্না উপেক্ষা করে সে বলে যেতে লাগল হৃদয়হীনের মতো, 'তুই কি সহজে যাবি রে সর্বনাশী! এখনো যে অনেক বাকী। একটা সংসার পুড়িয়ে খেয়ে এসেছিস—এইবার আমায় খাবি তবে যাবি। তার দেরী আর বড় নেই।

যেদিন থেকে শ্বশুরকুল ছারখার করে ঢুকেছিস আমার ঘরে সেই দিনই বুঝতে পেরেছি এইবার··· ।'

সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশ জুড়ে যে সব কালো কালো মেঘের জটলা আরম্ভ হয়েছিল গভীর রাত্রে তারা বর্ষণ শুরু দিলে মুষলধারে। কালাচাঁদ ভিজে বিছানায়, গায়ে চালের ঘুটো থেকে পড়া জলের ঝাপটা লেগে জেগে উঠল। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। অপ্রচুর ছাউনি ফুঁড়ে প্রবল ঝাপটায় মেঝে বিছানা সব ভিজে গেছে—তবু এই ঘরটাই দুটোর মধ্যে ভাল।

হঠাৎ কালাচাঁদের মনে হল তার ঘরেই যখন এমন হাল তখন পাঁচির ঘর না জানি কি হয়ে গেছে! বেচারী বোনটি তার! একবার তবু সে ডেকেও বলেনি, 'দাদা, সব ভিজে যাচ্ছে।' কালাচাঁদ বেরিয়ে দেখলে সমস্ত ঘরটা জলে জলময় হয়ে গেছে—আর সেই ঘরে ভিজে-বিছানায় পাঁচি নিশ্চল হয়ে বসে আছে হাঁটুতে চিবুক রেখে। কেরোসিনের ডিবেটা এক একবার জলের ঝাপটায় নিবু নিবু হয়েও জ্বলছে। বিছানাটা ভিজে স্যাঁতা হয়ে আছে, পাঁচির কাপড় চুলও ভিজে, তবুও পাঁচির ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই বোনই না একদিন তার বাপের বুকের হাড় ছিল! এই বোনেরই না একদিন বিয়ে দিয়েছিল তার বাপ এমন জাঁকজমক করে যে মুচিপাড়ায় কেউ তা কখনো দেখেনি! এই বোনই না নিজে আধপেটা খেয়ে-না-খেয়ে, গায়ের গয়নাগুলো পর্যন্ত খুইয়ে দাদার পাতে ভাত দিয়েছে! মুচির ঘরে কার এমন বোন আছে? আর এই ষোল বছর বয়স থেকেই যার জীবনের সব সাধ ঘুচেছে সেই দুখিনী সর্বসহা বোনটিকে তার, সে কিনা আঘাত দিয়েছে। কেন? শুধু তার কেউ নেই বলেই তো! শুধু সে দু-মুঠো ভাতের ভিখিরী বলেই তো! শুধু তার পরবার একখানা কাপড় চেয়েছিল বলেই তো! বুকের নিম্নতম গহ্বর থেকে যেন কালাচাঁদের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে উঠল। পৃথিবীর সবাই তার পর, সবাই তাকে ঘৃণা করে, অপমান করে—সে গরীব, সে দুর্বল, কিন্তু এই যে একটি মাত্র মেয়ে শুধু তাকেই জানে, তাকেই ভালবাসে, তারই সেবা করে, একে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করে? এই বোনটি ছাড়া কে আছে তার, যার কাছে এই নির্মম স্বার্থপর সংসারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সহানুভূতির আশা সে করতে পারে?

কালাচাঁদ ডাকলে 'পাঁচি!'

পাঁচি চমকে মুখ তুললে, তার দুচোখে জল—কেরোসিনের ডিবের আলোয় চক্ চক্ করছে।

কালাচাঁদের চোখ শুকনো ছিল না, বললে, 'অমন করে ভিজে মাটিতে বসে ভিজলে অসুখ করবে না ?'

পাঁচি হতভম্বের মতো দাদার চোখের পানে চেয়ে রইল।

'আমার ঘরটা তবু শুকনো আছে একটু। আয়, উঠে আয়।'

পাঁচি আবার মুখ হাঁটুর ভেতর গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কালাচাঁদ কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে ধরা গলায় বললে, 'তারা যে মজুরি দিলে না পাঁচি, সাধ করে কি আমি কাপড় আনিনি, সাধ করে তোকে গাল দিয়েছি। তারা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, আর এক পয়সা দেবে না, কাজেও নেবে না।'

প্রায় সমস্ত রাত মুসলধারে বৃষ্টি পড়ে ভোরের সময় আকাশ একটু ক্ষান্ত হল। সমস্ত রাত দুখী ভাই-বোন দুটিতে ভিজে মেজেতে ভিজে কাপড়ে জলের ঝাপটায় অর্ধেক নেয়ে জেগে কাটালে ভোরের প্রতীক্ষায়। কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা ? ভোর হলে তাদের কি লাভ ? পরবার কাপড় নেই। মজুরী পাবার আশা নেই। হাতে কাজও নেই। এখন কতদিন কাজ মিলবে না ভগবান জানেন। কোন্ আশায় তারা ভোরের প্রতীক্ষা করছে ? এই বর্ষাকাল এসে পড়ল, চালে পাতা নেই, এই পুরোনো দেয়ালের মাটি ধুয়ে যাবে—ভাড়া দেবার সংস্থান নেই, মেরামত করবারও ক্ষমতা নেই।

অপরূপ পৃথিবীর মেঘ-ভাঙা ভোরের আলো তাদের ক্লান্ত চোখে অসীম প্রাণ সমারোহের কোন উল্লসিত স্পন্দন বয়ে নিয়ে এল না।

আট

উল্কি-কাটা বাইশ বছরের মেয়েটা ঘুমোতে পারছিল না। টিনের চালে বৃষ্টির মাতামাতি তাকে বিশেষ বিরক্ত না-করলেও তার ঘুম আসছিল না। বাইশ বছরের মেয়ের মনে অনেক স্বপ্ন অনেক গানের ভিড়,—বিশেষতঃ বর্ষা-রাতে। কিন্তু সে তো বিদ্যাপতি পড়েনি, 'গীতাঞ্জলি'র নামও শোনেনি। সুতরাং তার মনকে যা অস্থির করে তুলেছিল তা 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' নয়।

কাঁথাটা আর-একবার ঝেড়ে সে আবার পাশ ফিরে শুলো। তাতেও হল না। উঠে ডিবিয়াটা জ্বাললে। অপরিষ্কার আলোয় ছোট ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শুকনো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছিল—জড়িয়ে একটা আলগা খোঁপা বাঁধলে। তারপর আর কি করবে ভেবে পেল না। এমন

কেন হচ্ছে সে বুঝেও বুঝতে পারছিল না—কেন মনটা করকর করছে—অস্ফুট রাগে না দুঃখে—না দুয়েতেই ? হঠাৎ কি খেয়াল হল, ভাঙা টিনের তোরঙ্গটা খুলে, টিনের সস্তা একটা আর্শি বার করে সে মুখ দেখতে বসল। অস্পষ্ট আলোয় আর আর্শির গুণে মুখটা অসম্ভব চ্যাপটা ও বাঁকা দেখাল, বিরক্ত হয়ে নানা রকম করে ঘুরিয়ে দেখলে মুখটা তেমনি বিশ্রী দেখায়। আর্শিটা রাগ করে তোরঙ্গে পুরে রাখলে। কিন্তু কেন কে জানে তার কান্না পাচ্ছিল, কার ওপর যেন অভিমান হচ্ছিল! টিনের চাল কাঁপিয়ে ওপরে বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ হাঁকছে আর চিকুর খেলছে থেকে থেকে।

কাল সে একবারও কথা কয়নি—তার ওপর অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর কাজ করতেও আসবে না···কাল সকাল থেকে ওই ন্যাকা শিবুর ন্যাকাপনা তাকে সহ্য করতে হবে বিশ্রী, ভয়ানক বিশ্রী !··

পাশের ঘরে মোটা গয়লানীটা অকাতরে ঘুমোচ্ছিল আর নাক ডাকাচ্ছিল। এমন বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ! ইচ্ছে কচ্ছিল থাবড়া দিয়ে জাগিয়ে আসে। আচ্ছা, সে তো তাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা-তামাশাই করে, মরলে চেয়ে দেখে না—তবে সে কেন মরে তার জন্যে ভেবে ? কাল সে অপমানিত হয়েছে, রোজ পায়নি—তাতে তার কি ? সেবার যখন ভারা ভেঙে পড়ে তার নিজের পা-টা ভেঙে গেছল, তখন সে একবারটি দেখতে এসেছিল কি ? সে কত না আশা করেছিল অন্তত একবার দেখতে আসবে ! কিন্তু আসেনি তো ! বরঞ্চ শেষে ঠাট্টা করে বলেছিল—'খোঁড়া বিবির ঠ্যাং জোড়া লেগেছে ?' তবু সে কেন মরছে তার জন্যে ভেবে ?—

আলোটা মিছি মিছি জ্বলছে। ফুঁ দিয়ে সেটা নিবিয়ে অন্ধকারে সে জলের শব্দ শুনতে লাগল। উল্কি-কাটা গরীব মজুর মেয়ের পিয়াসী বাইশ বছর ঐ বৃষ্টির সুরে অস্পষ্ট করুণ হয়ে বাজছিল কি না কে জানে !

* * * *

ভোর হয়ে গেছল। তবু সে জেগে বিছানায় পড়ে ছিল। আজ আর ওঠবার আগ্রহ তার ছিল না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল তবু মনে হচ্ছিল যাক গে। দুটো হাতের পাতার ওপর মাথাটা রেখে সে চিৎ হয়ে ছাদের দিকে চেয়ে পড়ে ছিল।

'নেত্য।'

বাইরে থেকে কে ডাকলে। স্বরটা অসম্ভব চেনা তাই বিশ্বাস হল না।

বিরক্ত হয়ে বললে—'কে ? আমি এখন উঠতে পারি না বাপু।'

'একবারটি যদি উঠিস!'

নেত্যর বিশ্বাস হল না কিছুতেই—এ যে ভাবা যায় না! উঠে দোর খুলে দেখলে—সামনে কালাচাঁদ! ঝুঁটি-বাঁধা বিশ্রী খোঁপাটা, রাত্রে শোবার জন্যে পরা ছেঁড়া কুৎসিত কাপড়টা, ঘুম থেকে ওঠা ময়লা ময়লা চেহারার কল্পনা নেত্যর সর্বাঙ্গে ছুঁচের মতো বিঁধতে লাগল। সে প্রায় অস্ফুটস্বরে বললে,—'এস।'

কালাচাঁদ অপ্রতিভের মতো ঘরে ঢুকে বললে,—'বলতে এলুম যদি কাজ-টাজের খোঁজ পাস খবর দিস।'—গলাটা ধরা।

নেত্য সরু জানালাটা খুলে দিয়ে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়ে বললে,

—'বোস।'

—'না না, বসব না, শুধু ওই কথাটা বলতে এলুম।'—বলে কালাচাঁদ চঞ্চল হয়ে উঠল।

কি একটা কথা যেন তার অসমাপ্ত রয়ে যাচ্ছে, নেত্য বুঝতে পাচ্ছিল। কাতর হয়ে নেত্য বললে,—'একটু বোস না।'

নেত্যর বুক কাঁপছিল—আনন্দে না বিস্ময়ে সে বুঝতে পারছিল না। প্রিয়তমের আশাতীত দেখা পাওয়ায় বাইশ বছরের নারীর বুক যেমন করে কাঁপে তেমন-ই কাঁপছিল, ময়লা কাপড়ের আড়ালে কালো চামড়ার তলায়—রক্ত রাঙা হৃদয়ের গোপনতায়।

কালাচাঁদ বসল উত্তেজনার মতো। শুকনো রুক্ষ চেহারা, কাল থেকে বোধহয় ঘুম হয়নি। নেত্যর ইচ্ছে করছিল লজ্জার মাথা খেয়ে কেঁদে বলে ফেলে—'তোমার শুকনো মুখ দেখলে কান্না পায়। কেন তুমি আমায় পর ভাব?'

কালাচাঁদ যে জন্যে এসেছিল এখানে এসে আর সে-কথা বলতে জোর পাচ্ছিল না—বাধছিল। যদি নেত্য বলে,—'না, নেই।' কি অপমান তাহলে!

একটু উস-খুস করে কালাচাঁদ বললে, 'আর ভাবছিলুম কি, যদি একটা কাপড় তোর বেশী থাকে—পাঁচির পরবার কাপড় নেই কিনা—এই ক'দিনের জন্য দিস, আমি একটা কাজ পেলেই শোধ করে দেব, অবশ্যি যদি তোর অসুবিধে না হয়।'

নেত্যর মুখের কোন উত্তর না পেয়ে কালাচাঁদ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। খোঁচা না দিয়ে যে কোনদিন কথা কয়নি তার মুখের এই সঙ্কোচে নেত্যর কণ্ঠ গলা ধরে যাচ্ছিল কান্নায়। লোভ হচ্ছিল এই নির্জন ঘরে একবারটি ওর পায়ের কাছে মাথা রেখে বলে,—'তুমি আমায় ঠাট্টা কর, গাল

দাও, যা-খুশী তাই বল, কিন্তু অমন কাঙালপনা করো না, আমি সইতে পারি না।' কিন্তু সে শুধু ধীরে বললে,—'আছে। তুমি একটু বোস, আমি আসছি।'

প্যাটরা খুলে আবার বন্ধ করে নেত্য বেরিয়ে গেল।

কালাচাঁদ দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ভাবছিল ছেলেবেলার ফুর্তির আর এখনকার দুঃখের কথা। এই জীবন থেকে কোনদিন রেহাই পাবার কোন আশাও সে দেখতে পাচ্ছিল না মৃত্যু ছাড়া—সে আবার কি রকম মৃত্যু?—সহায়হীন—মুখে একটু জল দেবার লোক নেই, একটা মিষ্টিকথা বলার লোক নেই, যেমন করে তাদেরি বাড়ির পাশে হারু বুড়ো মরছে ময়লা কাঁথায় মল-মূত্রে একাকার পশুরও অধম হয়ে। এই তো তার পরিণাম! সে শিউরে উঠছিল। এই রকম খাটতে খাটতে যেদিন হাড়গুলো পাকাটির মতো পলকা হয়ে যাবে, চামড়া শুকিয়ে কুঁকড়ে যাবে, নড়বার সামর্থ্য থাকবে না, তখন ধীরে ধীরে মরতে হবে একলা বন্ধুহীন হয়ে। আর আজ বোনের কাপড় নেই পরার, নিজের দু-মুঠো ভাতও রোজ জোটে না। আগের জন্মে সে কার মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিল তাই আজ তার এই শাস্তি।

একটা বড় শালপাতার ঠোঙায় মুড়ি মুড়কি আর বেগুনি ফুলুরি নিয়ে ঘরে ঢুকে নেত্য কালাচাঁদের কাছে রেখে বললে,—'খাও।'

চমকে কালাচাঁদ বললে,—'সে কি? না না!'

'নইলে আমার মাথা খাও,—খেতেই হবে।'

'পাঁচি কাল থেকে উপোসী· ।'—বলে ফেলেই লজ্জায় কালাচাঁদ চুপ করে গেল।

এতক্ষণে নেত্য সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলে ভাল করে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—'তবু তুমি আমায় কিছু বলোনি কোন দিন!'

'কি বলব? আমি কি নিজেই জানতুম।'

'আজকে তো জানতে, আজ এতক্ষণ কোন কিছু বলেছিলে?'

কালাচাঁদ চুপ করে রইল।

নেত্য বললে, 'ওগুলো তুমি খাও।'

'না, আমার খিদে-টিদে নেই, একটা কাপড় থাকে তো দে, তার পরার কাপড় একেবারে নেই।'

'আগে তুমি খাও তারপর দিচ্ছি!'

'আচ্ছা জ্বালাতন—।'

এইবার নেত্য হেসে বললে, 'তুমি তো অনেক জ্বালাতন করেছ, আজ না হয় আমি একটু করলুম।'

কালাচাঁদের খাওয়া হলে এক বাটি জল মাটির কলসি থেকে গড়িয়ে দিতে দিতে নেত্য বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব এখনি, একটু বসে যাও।'

কালাচাঁদ অবাক হয়ে বললে, 'কেন?'

'আমার খুশী'—বলে নেত্য হাসতে লাগল। উল্কিকাটা মুখখানাও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কালাচাঁদ কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, 'বেশিক্ষণ বসতে পারব না কিন্তু।'

'না গো না, বেশিক্ষণ বসতে হবে না।' নেত্যর মন কালাচাঁদের এই দুঃখের দিনেও খুশী না হয়ে থাকতে পারছিল না। এই দুঃখই তো তাকে এমন করে নেত্যর কাছে টেনে এনেছে! নেত্য তোরঙ থেকে একটা পাটকরা ধোয়া কাপড় বার করলে, একটা টাকা আঁচলে বাঁধলে, তারপর বললে, 'চল।'

•

কালাচাঁদ এতক্ষণ অবাক হয়ে নেত্যর কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এইবার বললে, 'বাঃ! তুই কাজে যাবি না?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছে নেই।'

'কেন ইচ্ছে নেই?'

'যদি বলি তুমি যাবে না বলে?'

'বিশ্বাস করবো না।'

নেত্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তাই তো বলি না।'

'যাই হোক, এ কাজে না গেলে কোন্ কাজে যাবে?'

নেত্যর মুখের বাধা কেটে গিয়েছিল। বললে, 'তুমি যে কাজে যাবে।'

'আমার তো কাজ নেই দেখতে পাচ্ছিস, কবে হবে তাও জানি না।'

'আচ্ছা, সে পরে বোঝা যাবে, এখন চল।'

'না, না, আমার জন্যে কাজ কামাই করতে হবে না। আমি কাপড় নিয়ে যাচ্ছি, তুই কাজে যা।'

'অত ভয় কেন নিয়ে যেতে—বৌ তো আর ঘরে নেই যে হিংসে করে কোঁদল করবে ?'

দুঃখের মধ্যেও কালাচাঁদ হেসে বললে, 'না, সে ভয় কোন কালেও হবে না।'

'তবে চল।'

কালাচাঁদের কাছে নেত্যর এই কাজ কামাই করাটা ভালো লাগছিল না। সে বোঝাতে চাইলে। নেত্য কিন্তু অটল। শেষকালে সে বলেই ফেললে যে কালাচাঁদকে যারা অপমান করেছে, তাদের কাছে নেত্য কাজ করবে না, কক্‌খনো।

কালাচাঁদ শুধু কাতর চোখে নেত্যর দিকে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। কালাচাঁদ এই রকম একটা কিছুর আভাস আগে পেলেও কোনদিন এ বিষয়ে নিঃসংশয় হয় নি। আজ এই উক্তিকাটা মজুর-মেয়েটির নীরব প্রণয় নিবেদন তাকে একেবারে চমকে না দিলেও তার সমস্ত মনটি অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ করে দিলে। এই নিষ্ফল জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা ওই মেয়েটির কাতর চাউনীতে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল যেন। যাকে ভাগ্য ঘৃণা করে, ভগবান পায়ে ঠেলে, মানুষ মাড়িয়ে চলে, তারই জন্যে একটি মেয়ের হৃদয় উন্মুখ! অশিক্ষিত মূর্খ কালাচাঁদের মনে অপরিস্ফুট বাণীর সাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। তার অর্ধেক মানে সে বোঝে, অর্ধেক তার বুদ্ধির অতীত। সে শুধু বললে অনেকক্ষণ বাদে, 'একি সত্যি, নেত্য ?'

নেত্য উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিলে।

নয়

ভোরের কলকাতার একটা রূপ আছে, ঠিক রূপকথার পুরীর মতো সুন্দর। তখনও রাস্তায় লোক-চলাচল বেশি শুরু হয়নি; গাড়ি ঘোড়ার শব্দ নেই,—ঠিক এমনি সময়টা! এই কলকাতাকে জানে মাত্র কটি প্রাণী—প্রাণ দিয়ে জানে যারা, আরো কম তাদের সংখ্যা। এই ভোরের কলকাতার মায়াপুরীতে ঘুরে বেড়ায় নোংরা কানি-পরা ক'টি ছেলে-মেয়ে, টুকরী-হাতে গত রাতের উনুন থেকে ফেলা ছায়ের গাদায় আর টিনের ঘেরা জঞ্জালের স্তূপে। কচিৎ একটা ময়লার গাড়ি নিস্তব্ধতা ভেঙে চলে যায়। একটা ছুটো ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাড়ু দেয় সকাল সকাল কাজ শেষ করার আশায়। আর নইলে একেবারে নিস্তব্ধ। এই ভোরে জঞ্জালের মতো শহরের এক প্রান্তে ঝেঁটিয়ে ফেলা গরীবের

রাজ্য থেকে আসে সন্ধানী শিশুর-দল শহরের সত্যকার আবর্জনার সম্পদের সন্ধানে। একটা সিগারেটের ছবি, শার্শিভাঙা একটুকরো নীল কাঁচ, একটুখানি নীল পেন্সিল, ছেঁড়া রঙীন কাপড় একটুকরো,—এর বেশি সম্পদ তাদের কল্পনায় স্থান পায় না। তাদের ইতিহাসে যদিও নানা অদ্ভুত ধন পাওয়ার কাহিনী আছে—কবে মন্নুয়া দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছিল কেমন করে কোন্ রাস্তার কোন্ কোণে, কাদা-মাখা,—তা এই শিশুর দলের প্রত্যেকে জানে। কবে ক্যাস্ত ছায়ের গাদায় সত্যিকাবের সোনার আংটি পেয়েছিল, হরে ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিল ইত্যাদি অনেক গল্প তাদের কণ্ঠস্থ। এসব গল্প জানা একটা বাহাদুরী, না-জানা লজ্জার কথা। ভোরের কলকাতায় এই সন্ধানী সম্প্রদায় ছায়ের গাদায় আধ-পোড়া কয়লা কুড়োয়, তারপর সমস্ত দিন আপন খুশীমতো ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যায় বড়রাস্তাব মোড়ে ভদ্রলোকের হাতে পায়ে ধরে পয়সা ভিক্ষে করে। ভিক্ষে করার বুলি আওড়াতে যার যত তালিম তার তত খাতির। যে মেয়েটার ছোট শিশু ভাই কি বোন আছে, সে ভাগ্যবতী। এই কিশোব সম্প্রদায় শহরে অজান্তে বেড়ে ওঠে, কেউ চোর হয়, কেউ গাঁটকাটা, কেউ পতিতা, কেউ কুলি। ভাগ্যক্রমে কেউ-বা আবার উতরে যায়, খাটতে শেখে, ঘর-সংসার করে। কেউ ফিজিতে চালান যায়—কেউ আফ্রিকায়, কেউ চা-বাগানে। আবার নতুন দল তাদের জায়গা দখল করে।

রাস্তার বে-ওয়ারিশ কুকুরগুলো তাদের চেনে। তারা যে মানব-সমাজের বে-ওয়ারিশ মাল! তাদের সঙ্ঘ আছে, শাসন আছে, আইন আছে কানুন আছে। নিয়ম ভাঙলে তারা শাস্তি পায়। তাদের মিশ্র ভাষা হিন্দি-বাংলা—আটকায় না কোনটাই। যুদ্ধবিগ্রহও আছে তাদের। প্রথম নিয়ম, আগে যে রাস্তা যারা নেবে সে রাস্তা তাদের। কারুর বা মৌরশী রাস্তা আছে। রাস্তার চৌমাথা-গুলো তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করা। একজনদের মোড় আরেকজনরা নিতে পারে না। নিজেদের ভেতর তাদের আইন,—যে বাবু একজনকে এক পয়সা দিয়েছে, তাকে সকলকে দেখিয়ে দিতে হবে। না দেখালে হরতাল তার সঙ্গে। তাদের বিধি আছে, যথা,—ময়লার গাদায় হাত দেবার আগে যদি কাকের ডাক শোনা যায়, তা হলে কিছু মিলবে না।—যে রাস্তার ধুলোয় পাখির পায়ের দাগ সে রাস্তা অপয়া। বাদলার দিন বাবুরা বেশি পয়সা দেয়। ইত্যাদি।

দশ বছরের আহ্লাদী আর ন বছরের শশী প্রত্যহ সকালে ভাঙা চুবড়ি

নিয়ে বেরোয়। এর মধ্যেই শশী সমস্ত গালাগালে দুরন্ত হয়ে তাদের দলকে চমকে দিয়েছে। আহ্লাদীও এর মধ্যে ছোট্ট দু-বছরের হাবাকে কোলে করে বেশ দু-পয়সা ভিক্ষে করতে পারে। কম বয়সের বাবু দেখলে সে চমৎকার বলতে পারে,—'বাবু, তোমার রাঙা রাঙা বউ আসবে, বাবু তোমার গোড় লাগি, রাঙা ছেলে হবে বাবু—।'

একটু বেশি বয়স দেখলে সে বলে—'বাবু, এই বাচ্চার জন্যে এক পয়সার মুড়ি কিনব বাবু, সারাদিন খায়নি বাবু, দুধের বাচ্চা বাবু, বাবু তুমি রাজা হবে··· ।' দুধের বাচ্চা আহ্লাদীর কোলে হাবার মতোই চেয়ে থাকে।

বাদলার দিন। তবু প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেলেও আহ্লাদী কিছু পায়নি। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ট্রাম থেকে নেমে ব্যস্ত ভদ্রলোকেরা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছিল। নিজের নোংরা আঁচলটা দিয়ে কোন রকমে শিশু ভাইয়ের মাথাটা ঢেকে বৃষ্টির মাঝে আহ্লাদী ছুটোছুটি করছিল, এমন সময় শশী এসে জিজ্ঞেস করলে, 'ঘরকে যাবিনি ?'

আহ্লাদী বললে, 'না, তুই যা।'

শশী কৌতূহলী হয়ে বললে, 'কিছু পাসনি বুঝি ?'

'তোর সে খোঁজে কি দরকার ? তুই কি পেয়েছিস ?'

শশী ট্যাঁক থেকে তিনটে পয়সা বার করে দেখালে। ছোঁ মেরে একটা পয়সা কেড়ে নেবার বিফল চেষ্টা করে আহ্লাদী বললে, 'একটা পয়সা দে না ভাই, সেই সকাল থেকে হাবু কিছু খায়নি !'

হাত পাঁচেক সরে গিয়ে শশী বললে, আহা হা ! আবদার আর কি ! নিজের পয়সায় খাওয়াও না !'

লজ্জার সঙ্গে আহ্লাদী স্বীকার করলে যে, সে একটা পয়সাও পায়নি।

শশী কিন্তু পয়সা না দিয়ে চলে গেল।

সমস্ত দিনের অনাহারে বৃষ্টিতে ভিজে ক্লান্ত কাতর ছেলেটা কোলে কাঁদতে লাগল। আহ্লাদী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা পয়সা অন্ততঃ না পেয়ে সে আজ যাবে না।

'আহ্লাদী, ঘর যাই, আয় লো !'—কাঁকালে ছেলে নিয়ে আরেকটি হাড়গিলের মতো মেয়ে এসে দাঁড়ালো।

'যাব পরে।'

'ভারী বৃষ্টি নামবে এক্ষুণি, দেখছিস না কি রকম অন্ধকার ঘুটঘুটি হয়ে আসছে।'

'নামুক, তুই যা।' বলে আহ্লাদী ক্রন্দনরত ভাইকে ত্রস্তহাতে তুলিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত শিশু থামল না।

আরেকবার হাড়গিলের মতো মেয়েটা যেতে অনুরোধ করলে। আহ্লাদী রাজী না হওয়ায় বলে গেল,—'ভাতারের জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? আসবে না!'

আহ্লাদী সে কথা গ্রাহ্য না করে রাস্তার দিকে ছুটল ছেলেটাকে কোলে চেপে। একটি সুবেশ ভদ্রলোক তখন ট্রাম থেকে নামছিলেন। আহ্লাদী দৌড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বাঁধা গৎ আওড়াতে আওড়াতে তাঁর সঙ্গে চলল। ভদ্রলোক দু-একবার বললেন, 'না, না, হবে না কিছু।' শেষকালে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা ছাতি খুলে চললেন। আহ্লাদী সঙ্গে সঙ্গে যত রকম বুলি জানত, আওড়াতে আওড়াতে চলল বহুদূর। ভদ্রলোক কেয়ার করলেন না। হাঁফিয়ে উঠে শেষে রেগে আহ্লাদী বলে ফেললে, 'দূর মিনসে।'

স্তম্ভিত হয়ে ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়ালেন। পাশ দিয়ে একটা পাহারাওয়ালা যাচ্ছিল, বললেন, 'পাকড়ো বদমাস লেড়কিকো।'

পাহারাওয়ালা ঠাট্টা করে তাড়া দিল। প্রাণের ভয়ে সমস্ত দিনের অনাহারে ছেলে-বওয়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহ প্রাণপণে মেয়েটা ছুটলো একেবারে রাস্তা থেকে একটা গলির ভেতরে। যতক্ষণ না হাঁফিয়ে দম বন্ধ হবার মতো হলো ততক্ষণ থামতে সাহস হলো না। থেমে আশ্বস্ত হয়ে দেখলে পেছনে পাহারাওয়ালা নেই। ছেলেটা দৌড়ের ঝাঁকানিতে চীৎকার করে কাঁদছিল আর দুটি মাত্র তার শেখা কথা বলতে চেষ্টা করছিল 'দি—দি ভু—।'

একটা বাড়ির নীচু রকে আহ্লাদী ছেলেটাকে নিয়ে বসে হাঁফাতে লাগল। শুধু হাতে ফিরলে বাড়িতে মা বিশ্বাস করবে না, বলবে, 'সব খেয়ে এসেছিস।' অথচ আজ আর পাবার আশা মোটেই নেই। ক্ষিদেয় কে যেন পেটের ভেতরে নাড়ী ধরে পাক দিচ্ছে মনে হচ্ছিল। বাড়ি গেলে তবু যাহোক খেতে পাবে জেনেও তার বাড়ি যেতে সাহস হচ্ছিল না। বৃষ্টি জোরে পড়তে আরম্ভ হলো, কচি বাচ্চাটা শীতে কাঁপছিল। খোলা দরজার চৌকাঠের ভেতর জলের ছাট থেকে আশ্রয় পাবার জন্য গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্কীর্ণ গলিতে একটিমাত্র কেরোসিনের আলো অন্ধকারকে ঘোলাটে করে তুলেছে। বাতির কাঁচে জলের ঝাপ্টা লাগছিল। দুটো বাদলা পোকা বৃষ্টির মাঝে কাঁচে মাথা ঠুকছিল। হঠাৎ ভেতর থেকে মেয়ে গলায় কে বললে, 'দুখিয়া, ভরসন্ধ্যেবেলা বাদলার দিন—সদর দরজাটা বন্ধ করে আয়, ছিঁচকে চোর ঢুকবে নইলে।'

আহ্লাদী চোর বলে লাঞ্ছনা পাবার ভয়ে সেই বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, এমন সময় বোধ হয় চাকরটা বলছে শুনতে পেলে; 'দরজা তো বন্ধ আছে।'

তবু খানিকটা দাঁড়ান যাবে!

ভেতর থেকে আবার মেয়ে গলায় শোনা গেল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুই আর একবার দেখে আয়।'

আবার কে বললে, 'বলছি মা, বন্ধ আছে, আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি।'

আহ্লাদী দরজার ছায়ায় মড়ার মতো নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। ছেলেটা ভীষণ কাঁপছে, তার ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে। হঠাৎ অন্ধকারে ছেলেটা কেঁদে উঠল। তার মুখে হাত চাপা দিয়ে আহ্লাদী থামাতে চাইলে—হতভাগা ছেলে বোঝে না যে এই বৃটিতে বেরুলে মারা পডবে। ছেলেটা চাপা হাতের ভেতর থেকে আরও জোরে কাঁদতে আরম্ভ করলে ভয় পেয়ে। ভেতরের ভয়-কাতুরে মেয়েমানুষটি আবার বললে, 'শুনছিস দুখিয়া, দরজার গোড়ায় কিসের শব্দ হচ্ছে?'

আহ্লাদী আর কিছু না শুনেই বেরিয়ে পড়ল বৃষ্টির মধ্যে। তার নিজের দাঁতে দাঁতে ঠোকা লাগছিল শীতে, তা ছেলেটার লাগবে তার আর আশ্চর্য কি! কচি বাচ্চাটা কাঁপতে কাঁপতে বলতে চেষ্টা করছিল' 'ডি—ডি হা—আ—ম।'

লম্বা গলিটার কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। সে ভিজতে ভিজতে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল। ওপরে ছাদ দেওয়া একটু রকের ওপর যত লোক গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এক তিল জায়গা নেই। তার ভেতর ঢুকতে গিয়ে একটি ভদ্রলোকের জুতো মাড়িয়ে ফেললে অসাবধানে। ভদ্রলোকটি চটে উঠে বললে, 'এই ছুঁড়ি, নাম এখান থেকে, দেখতে পাচ্ছিস নে জায়গা নেই।' তারপর তাকে ঠেলে নামিয়ে দিলে।

এবার আহ্লাদী কেঁদে ফেলে বললে, 'বাবু, তোমার পায়ে পড়ি বাবু, কচি ছেলেটা নইলে মারা যাবে।' একজনের একটু দয়া হলো। আহ্লাদী জায়গা পেলে। হতভাগ্য ছেলেটার কান্না কিন্তু আর থামে না। বিরক্ত হয়ে একজন বললে, তোর কি আক্কেল বল তো বদমায়েস ছুঁড়ি? দুধের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে বৃষ্টিতে নিয়ে বেরিয়েছিস!'

আর একজন বললে, 'বদমায়েশ বলে বদমায়েস, ওই বাচ্চাকে জলে ভিজিয়ে রোদে পুড়িয়ে রোজ ভিক্ষে করবে। পয়সার লোভে ছুঁড়ি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলছে!'

'ছুঁড়িকে চাবকান উচিত—আহা, বাচ্চাটা আধমরা হয়ে গেছে।'

'তুই ছুঁড়ি নিজে ভিক্ষে করবি, তা বাচ্চাটাকে মারতে আনিস কেন ?'

'আরে, নইলে যে ভিক্ষে করার জুৎ হয় না। ছেলেটাকে দেখিয়ে মায়াকান্না কাঁদার সুবিধে যে ঢের বেশি।'

তাদের তিরস্কার ও ছেলেটির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ আরো অনেকক্ষণ চলত, কিন্তু বৃষ্টি ধরে এল সুতরাং যে যার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

আজ আর কিছু পাবার আশা নেই ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে শ্রান্তহাতে কোলে চেপে কাদায় পিচ্ছিল পথ দিয়ে আহ্লাদী বাড়ির দিকে ফিরল। কাঁকাল যেন ব্যথায় ভেঙে পড়তে চাইছিল হাত দুটো অবশ হয়ে আসছিল মোড়ের কাছে পেছনের মোটরের আওয়াজ শুনে চমকে ধারে সরে সরে আসতে গিয়ে সে পিছলে পড়ে গেল, মোটরটা কোন রকমে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু ওধার থেকে একটা ছ্যাকরা গাড়ি রাস্তায় ছিটকে-পড়া ছেলেটার বুকের উপর দিয়ে চলে গেল রাস্তার লোক হৈ হৈ করে উঠল। একটা বিষম হট্টগোল বেঁধে গেল। আচ্ছন্নের মতো কাদা থেকে গা ঝেড়ে উঠে আহ্লাদী দেখলে ভাই-এর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠেছে।

কে একজন ছেলেটার উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, 'নাঃ একেবারে শেষ হয়ে গেছে!'

· লোকজনের চেঁচামেচি, একটা সাদা পোশাক, তারপর অন্ধকার

দশ

পনের দিন আহ্লাদীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। তিনকড়ি কাজ কামাই করে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলে, কিছু খবর মিলল না। দুর্ভাগ্যক্রমে মুচিপাড়ার কেউ দুর্ঘটনার জায়গায় ছিল না তার পরদিন কোন খবরের কাগজের এক কোণে দুর্ঘটনার খবর বেরিয়েছিল হয়ত, কিন্তু খবরের কাগজের জগৎ আর মুচিপাড়ার জগৎ বুধগ্রহ থেকে পৃথিবীর মতোই পৃথক। একটা গুজব শুধু উঠেছিল, আহ্লাদী ছেলেটা সমেত চাপা পড়েছে, কিন্তু সত্য-মিথ্যা কিছু বোঝা গেল না। কোথায় কেমন করে সে খবরও পাওয়া গেল না।

পনের দিন পরে মুচিপাড়ায় কিন্তু বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। এক সাহেব খ্রীস্টান পাদরীর সঙ্গে হঠাৎ ফরসা কাপড় সেমিজ পরে আহ্লাদী কোথা থেকে হাজির! আহ্লাদী বাড়িতে ঢুকেই বাপ-মাকে দেখে চীৎকার করে

কাঁদতে শুরু করে দিলে। একলা আহ্লাদীকে দেখে আহ্লাদীর মা আছড়ে মাটিতে পড়ে বুক চাপড়াতে আরম্ভ করলে। আহ্লাদী কাঁদলে, কিন্তু মাটিতে আছড়ে পড়ল না। জন্মদুঃখী মেয়েটার যে ভাইয়ের শোকেও এত ভাল কাপড় জামা ময়লা করবার ক্ষমতা নেই।

তখন বাইরে পাদ্রী সাহেবকে ঘিরে পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার তারা আর কখনও দেখেনি। সত্যিকারের গোরা সাহেব তাদের আহ্লাদীকে নিজে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছে, আর ভদ্রলোক করে মেয়ের মতো জামা কাপড় পরিয়ে।—এ যে ভাবাও যায় না। পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটির বাপ কি এখানে আছে?'

বিস্মিত লোকগুলোর ভেতর একজন সাহস করে বললে, 'না, সে ভেতরে আছে, ডেকে দেব?'

সাহেব বললেন, 'দিলে ভাল হয়।'

দু-তিনজন মিলে হতভম্ব তিনকড়িকে ডেকে আনলে। সাহেব তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ কি বলাবলি করলেন। তারপর গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন। সাধারণতঃ তিনকড়ি মুচিপাড়ার সবার চেয়ে একটু গম্ভীর, একটু পৃথক। দশটা কথার উত্তরে সে একটা কথা কয়—তাও কাজের কথা। কৌতূহলে বুক ফেটে গেলেও প্রথমে কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলে না। তিনকড়ি ঘরে চলে যায় এমন সময় একজন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললে, 'তোমার সাথে সাহেব কি কথা কইলো গো?'

তিনকড়ি ঢুকতে ঢুকতে শুধু বলে গেল, 'ও কিছু নয়।'

খানিকক্ষণের মধ্যে মুচিপাড়ায় রটে গেল, তিনকড়ি সপরিবারে 'খিরিস্টান' হয়ে গেছে। সাহেব নাকি অনেক টাকা দিয়ে তাকে রাজী করিয়েছেন, আর তারা শীগগিরই এ-বাসা ছেড়ে তাদের নতুন কোঠা বাড়িতে উঠে যাবে।

এগার

রেভারেণ্ড স্ট্যান্লি ত্রিশ বছরের যুবা। ইংলণ্ডের এক সম্পন্ন লর্ড ফ্যামিলির ছেলে ও অক্সফোর্ডের এম.এ. হলেও তিনি বাইশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে চিরকুমার ব্রত নিয়ে পাদ্রী হয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কলেজ-জীবনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিশত তারা কিন্তু এই পাদ্রী হওয়ায় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল। পাঠ্যাবস্থায় তাঁর অন্তরের এই দিকটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আভাস

তারা পায় নি। তাঁর আলাপী মহল তাই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের মূলে একটা ব্যর্থ প্রেমের ব্যথা আছে বলে সন্দেহ করত। অক্সফোর্ড ইলেভেন্-এর ক্যাপটেন, চির-স্ফূর্তিবাজ, সকল কাজে ওস্তাদ স্ট্যান্‌লির পাত্রী হওয়া একটু আশ্চর্যই বটে। কিন্তু অতল সমুদ্রের চেয়ে যে মানুষ রহস্যময় তার অন্তরের খবর কে জানে? ছেলেবেলা থেকে স্ট্যান্‌লির একটা টান ছিল যত প্রাচীন কীর্তিময় ধ্বংসাবশেষ দেশের দিকে। মিশর, বিশেষ করে ভারতবর্ষ তাঁর মনে একটা অপূর্ব মোহের সঞ্চার করত। মনে হতো ব্যস্ত ইউরোপের কারখানার জগৎ থেকে সে একটা বিভিন্ন জগৎ—স্বপ্নময় চিরগোধূলি-বেলার। রবিবাবুর কবিতা তখন ইউরোপে সবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। স্ট্যান্‌লি গীতাঞ্জলির অনুবাদ পড়লেন, সব বুঝতে না পারলেও মনে যেন একটা নেশা ধরে আছে বলে মনে হলো, একটা অর্ধ চেতনাময় মধুর নেশা। শকুন্তলার অনুবাদ পড়লেন, ভারতকে জানবার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তখন ভারত জুড়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, কিন্তু এই স্বপন-ধেয়ানী ভারত পূজারীর স্বপ্ন সে তীক্ষ্ণ চীৎকারে একটুও ভাঙল না। তারপর যখন যাজক হলেন তখন চেষ্টা-চরিত্র করে স্ট্যান্‌লি ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করতে যাবার অনুমতি যোগাড় করে অক্সফোর্ড মিশনের মেম্বার হয়ে কলকাতায় এলেন।

হায়! কল্পনার ভারতবর্ষে আর সত্যকার ভারতবর্ষে কি এত প্রভেদ হতে পারে? স্ট্যান্‌লির সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। গরীব তেমনি এখানে খেতে পায় না—স্বার্থ নিয়ে মানুষে মানুষে তেমনি কামড়া-কামড়ি এখানে, দারিদ্র্য তেমনি বীভৎস, তেমনি নিষ্ঠুর—তেমনি সীমাহীন। মজুররা তেমনি শীর্ণ বুভুক্ষু অশিক্ষিত কদর্য। স্বপ্ন ভেঙে গেল তো গেলই। স্ট্যান্‌লির মনে হলো ভগবান তাঁকে বিনা উদ্দেশ্যে ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেননি! এই দুঃখী মুমূর্ষ জাতটাকে যীশুর বাণী দিয়ে আবার সঞ্জীবিত করতে হবে, সেই বিরাট দুঃসাধ্য কাজের একজন কর্মী হবার জন্যই ভগবান এমন করে তাঁকে এখানে এনেছেন। এই জাতটা একদিন যে ধর্ম সাধনায় ভগবানের খোঁজে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল সেটা জানা স্ট্যান্‌লির কাছে বিশেষ দরকারী মনে হলো না। তার দর্শনের সূক্ষ্মতা যত বেশিই হোক না, ও তার সাধনা যত বিরাট ও মহানই হোক না—সে সাধনা যখন তাকে অধঃপাত থেকে বাঁচাতে পারেনি, তখন তার কোন বিশেষ মূল্য আছে বলে স্ট্যান্‌লির মনে হয়নি। স্ট্যান্‌লির আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমাগতই বলতে লাগল যে ভারতে খ্রীস্টের বাণীর প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি এবং তিনি সেই জন্যেই ভগবানের প্রেরিত। অক্সফোর্ড মিশন-এর সভ্য

হয়ে প্রথমে এ দেশে এলেও স্ট্যান্‌লি বেশিদিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারলেন না। অক্সফোর্ড মিশন ভারতের সঙ্গে কারবার করে বিজ্ঞ হয়েছে, তারা অকারণ উত্তেজনা অতিরিক্ত আগ্রহ ইত্যাদি পছন্দ করে না। কিন্তু স্ট্যান্‌লির চিরকালের স্বভাব মেতে ওঠা, না মেতে উঠে কোন কাজ করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং স্ট্যান্‌লির সঙ্গে মিশনের কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধতে লাগল, তিনি তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। নিজে চেষ্টা করে বিলেতে গিয়ে টাকা যোগাড় করে ফিরে এসে ছোট জাতের শিশুদের জন্যে একটা পাঠশালা খুললেন, তার সঙ্গে একটা অনাথাশ্রম। স্ট্যানলির ধারণা ছিল এই গরীব শ্রমিক ছোটলোকদেরই সবচেয়ে বেশি দরকার যীশুর সান্ত্বনার। তাদের মধ্যে পাপ প্রবল, দারিদ্র্য ভীষণ, দুঃখ অসীম—'They that be whole need not a physician, but they that are sick.' আর 'Come unto Me all ye that labour and are heavy laden and I will give you rest.'

এই ছোট জাতকে তাদের নিজের দেশের লোক পায়ে ঠেলে। তাদের প্রতি ভাগ্য বিমুখ—মানুষ বিমুখ। শয়তান তাই এই ছন্নছাড়াদের বশ করতে এত সুবিধে পায়। ভগবানের আশীষবাণী শোনা তাদেরই তো সবচেয়ে দরকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্ট্যান্‌লি ছোটলোকদের ভেতর মিশে তাদের মিষ্টি কথা বলে, দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে হতাশায় আশা দিয়ে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। বাধা বিস্তর—তারা তাঁর এই সহৃদয়তার মূলে সর্বদাই একটা কিছু মতলব আছে সন্দেহ করে—বাইরে কেউ শ্রদ্ধা দেখালেও তাঁর সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না, চায়ও না। কেউ সাহেবের মাথা খারাপ বলে ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, কেউ সাহেবকে বুদ্ধি দিয়ে নিরস্ত করতে চায়, বলে,—'সাহেব এরা ছোট জাত, যতই কর, এরা নেমক-হারামী করবেই; তোমার সামনে বলবে, সাহেবের যীশু ভাল, আর লুকিয়ে বলবে, খুব ফাঁকি দিয়ে পয়সা আদায় করেছি!' স্ট্যান্‌লি কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নন। সাগরপারের এই সদাশয় ইংরাজ নিজের বংশমর্যাদা জাত্যাভিমান তুচ্ছ করে লোকের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপহাস অবজ্ঞা করে বিদেশের দুঃখীদের জন্যে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসমতো নিজেকে নিয়োগ করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় অমনি গরীবের পাড়ায় কাজ সারবার পর বৃষ্টির জন্যে গাড়ি ভাড়া করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, এমন সময় ওই দুর্ঘটনা। শিশুটিকে

ও জ্ঞানহীন আহ্লাদীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মোটর ভাড়া করে তিনি মেডিকেল কলেজে গেলেন। ছেলেটা মারা গেছল। আহ্লাদীর ঘণ্টাখানেক বাদে জ্ঞান হলো। তাকে তিনি নিজের অনাথাশ্রমে রাখলেন কদিন সুস্থ করার জন্যে।

তিনকড়ির সঙ্গে পাদ্রী সাহেবের যে গোপন আলাপ প্রতিবেশীদের এত কৌতূহল উদ্রেক করেছিল তা বিশেষ কিছু গুরুতর ব্যাপার নিয়ে নয়। পাদ্রীসাহেব শুধু আহ্লাদী আর তার ভাইকে নিজের স্কুলে পড়াতে ও নিজের জায়গায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনকড়ি রাজী হয় নি।

তার পর দিন পাদ্রী সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মুচিপাড়ার বদ্ধ বিলে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। সাহেব সব ছেলেদের একখানি করে চমৎকার ছবি আর বয়স্কদের একখানি করে রঙীন বই যেচে দিয়ে গেলেন। মুচিপাড়ার ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। ভদ্রলোকরা কেতাব পড়ে তারা জানত। তাদের দু-একজনও অতিকষ্টে বানান করে বটতলার একটা-দুটো বই পড়তে পারত বটে সময় হলে, কিন্তু এমন ছবি সমেত বই প্রত্যেকের ঘরে—স্বয়ং সাহেবের দিয়ে যাওয়া—তাদের কাছে একটা অভাবনীয় ব্যাপার। কম বুদ্ধিমানরা নীরবে বইগুলো তুলে রাখলে সম্পদের মতো। বেশি বুদ্ধিমানরা বলাবলি করলে যে সাহেবের মতলব ভাল নয়। এমনি করে ভুলিয়ে সকলকে কি যে করবে সে বিষয়ে তাদের কল্পনা কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারলে না

দ্বিতীয় দিন আবার সাহেব যখন এসে সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কিছু পড়েছে কিনা, তারা অবাক হয়ে গেল। একজন বললে, 'খাবার সংস্থান করতে প্রাণান্ত, পড়ব কখন সাহেব?' আর একজন সায় দিয়ে বললে, 'পড়তে জানলে এমন দুর্দশা হয়!'

স্ট্যান্‌লি বললেন, 'আচ্ছা', যে দিন তোমাদের ছুটি থাকবে, আমি নিজে এসে তোমাদের সঙ্গে পড়ব।'

তারা হো হো করে হেসে উঠল বললে, 'আমাদের ছুটি মরলে।'

সাহেব উপায় না দেখে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা না পড়তে পারো, তোমাদের ছেলেপুলেদের আমার স্কুলে নিয়ে যেতে দাও।'

তাতে কেউ রাজী হলো, কেউ হলো না। কেউ বললে, 'খেটে খেতে হয় যাদের সাহেব, তাদের কি ও-সব বাবুয়ানী চলে? ওসব ভদ্রলোকের ছেলেরা পারে।'

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর সাহেব গুটিকতক বাপ-মাকে রাজী করিয়ে খাওয়া-পরার ভার নিতে স্বীকার করে ক'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে গেলেন।

আহ্লাদী তার নিজের বাড়ির দুঃখের তুলনায় অনাথাশ্রমের সুখ-সুবিধা কত বেশি দেখে এসেছিল। সেখানকার ছেলেমেয়েরা কি রকম বড় বড় লোকের ছেলেমেয়ের মতো ফরশা কাপড-জামা পরে—কি রকম না খেটে ভাল খায়-দায়, কি রকম আমোদ-আহ্লাদ করে—সত্যিকারের পুতুল নিয়ে খেলা করে!

আহ্লাদী যাবার জন্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলে। অনেক মিনতির পর তিনকড়ি শশীকে রেখে একলা আহ্লাদীকে পাঠিয়ে দিলে। শশী তাতে বিশেষ কিছু দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হলো না। সে তো আর সে স্বাদ পায়নি! তা ছাড়া তার দুরন্ত মন কোনরকম বাঁধাবাঁধিকে সইতেই নারাজ।

বার

যারা সারাদিন নিজের পেটের ধান্দায় ব্যস্ত থেকেও আরাম করে খাবার মতো দু-মুঠো বেশি চালের যোগাড করতে পারে না, পরোপকার করবার প্রবৃত্তি তাদের বড় থাকে না, থাকলেও করবাব ফুরসৎ তাদের নেই। সুতরাং হারু বুড়োর মৃত্যুশয্যায় বেগার খাটবার লোক মুচিপাড়ায় মেলোন। মাঝে মাঝে কেউ দয়া করে গালে একটু জল দিলে বুড়ো খেতে পেত, নইলে শুকিয়ে থাকত মলমূত্রে-মাখা বিছানায় পড়ে। হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা তারা করেনি এমন নয়, কিন্তু হাসপাতালে মরতে হলেও ভাগ্য থাকা চাই, অন্ততঃ সুপারিশ চাই বড় একটা বিদঘুটে কিছু রোগের। যে শুধু বার্ধক্যে অনাহারে অতিশ্রমে জীর্ণ হয়ে মরতে বসেছে তাব জায়গা সেখানে নেই।

আপনার বলতে হারুর যারা ছিল তারা বহুদিন আগেই সুখের সংসার থেকে সেলাম দিয়ে বিদায় হয়েছিল, শুধু বুড়োই জীর্ণ হাড়-ক'টা নিয়ে এত অযতনে অনাদরেও যেতে পারছিল না। যত দিন না হাত আপনা থেকে অবশ হয়ে পড়েছিল ততদিন হারু কারুর কাছে তা চিত করেনি। জ্যৈষ্ঠের গোড়াগুড়ি পর্যন্ত সে দুবল হাতে হাফসোল লাগিয়েছে। বে-ঠিক হাতের হাতুড়ি পেরেকের মাথায় না পড়ে আঙুলে পড়লেও ক্ষান্ত হয় নি—ক্ষান্ত হলে যে চলে না! জোয়ানকালে সে নাকি ভারি দুষমণ ছিল, গায়ে নাকি তার অসীম ক্ষমতা ছিল। আজ সেহ জোয়ানের ধ্বংসাবশেষের মৃত্যুশয্যায় একটু সাহায্য করবার জন্যে যদি সত্যি করে বলতে হয় তবে এক অষ্টাবক্র বাঁকাবুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না। একটু সময় পেলে শুধু মাজাভাঙা বাঁকাবুড়ীই এসে তার নোংরা কাপড়-চোপড়গুলো একটু বদলে দিয়ে যেত—হাতের কাছে এক ঘটি

জল, ছুটো ভাতের দানা রেখে যেত। কিন্তু বাঁকাবুড়ীকেই কে দেখে যে সে আবার অপরকে সাহায্য করবে! নিজের ছু-মুঠো ভাতের সংস্থান করতেই তার হাড় কালি হয়ে যেত। কোনদিন ফুরসৎ হতো, কোনদিন হতো না। এমনি করে হারুর অস্তিমের দিনগুলো কাটছিল। এমন সময় কোথা থেকে এক অচেনা সেবায়েত এসে হাজির হলো।

সাড়ে-ছ'ফুট লম্বা এই কালাপাহাড় লোকটির আকস্মিক আবির্ভাব বেশ একটু রহস্যে ভরা। মুচিপাড়ার কেউ তাকে চেনে না। সে মুচিপাড়ায় নিজের পরিচয় দিতে ব্যস্ত বলেও মনে হলো না। সকাল বিকাল ছুবার এসে হারুর কাপড় ছাড়িয়ে খাবার যোগাড় করে দিয়ে যেত, আর রাত বারোটা নাগাদ একবার খোঁজ নিয়ে যেত। হারুর সে যে কেউ নয় তা পাড়ার লোকেরা হারুর কাছে জিজ্ঞাসা করেই জেনেছিল, কিন্তু সে যে কে, সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। হারু বলত, গরীবের ভগবান পাঠিয়েছেন।

মিঃ স্ট্যান্‌লি হারুর অসুখের খোঁজ পেয়ে একদিন তার ঘরে গেলেন। অপরিচিত লোকটি হারুর নতুন বিছানা পাতছিল। মিঃ স্ট্যান্‌লি অনেকক্ষণ হারুর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে হাসপাতালে যায় না কেন? হারু জানালে যে তাকে নেয় না। স্ট্যান্‌লি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি নেয়াবার বন্দোবস্ত করলে সে যেতে রাজী আছে কি না?

হারু বললে, 'কেন যাব না সাহেব, আর কতদিন এখানে পড়ে পড়ে সকলকে কষ্ট দেব?'

'আচ্ছা, আমি সে বন্দোবস্ত করব।'

স্ট্যান্‌লি উঠতে যাচ্ছিলেন—লোকটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার বললে, 'আপনার কষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু।'

স্ট্যান্‌লি আবার বসে বললেন, 'কেন?'

'আমার সেটা ইচ্ছে নয়।'

'ওঃ, তাহলে আমার কোন কথা নেই—তুমি কি এর কোন আত্মীয়?'

'হ্যাঁ।'

হারু এতক্ষণ চুপ করে ছু-জনার কথা শুনছিল, এইবার লোকটির দিকে ফিরে বললে, 'কেন বাবা তুমি বাধা দাও? তুমি তো নিজের ছেলের বাড়া করেছ, কিন্তু আর কত তোমায় কষ্ট দেব? না বাবা, বুড়ো হয়েছি, মরতে ছুঃখ নেই, হাসপাতালই আমার ভাল।'

লোকটি শুধু ধীরে ধীরে বললে, 'হাসপাতালে পাঠানো সুবিধে হলে অনেক আগেই পাঠাতাম—আমায় কষ্ট দেবার ভয় নেই।'

তারপর নীচু দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল। স্ট্যান্‌লি খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও তোমার কে হয় হারু?'

'কেউ না সাহেব; ও দেবতা—আমার কোন্ পুণ্যিতে জানি না আমার শেষ বেলায় মুখে জল দিতে এসেছে।'

'ও যে বললে তোমার আত্মীয় হয়?'

'তা তো আমিও শুনলুম। এজন্মের কেউ নয়, আর জন্মের হয়তো হবে।'

স্ট্যান্‌লির ইচ্ছা হয় বলেন, 'আর-জন্ম কি আছে পাগল', কিন্তু বৃথা জেনে চুপ করে রইলেন। ওঠবার সময় বলে গেলেন, 'হাসপাতালে তোমার কিন্তু কিছু কষ্ট হতো না।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছল। সাহেবের আর এক জায়গায় জরুরী কাজ ছিল। মোড়ে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করলেন। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছলে গাড়োয়ানকে একটা টাকা দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন, গাড়োয়ান পিছু ডাকলে। স্ট্যান্‌লি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন, আমি তোমায় চার আনা বেশী দিয়েছি তো।' গাড়োয়ান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ সাহেব, তাই তো ফিরিয়ে দিতে ডাকলুম।'

স্ট্যান্‌লি বললেন, 'না না, ও আমি তোমায় বকশিস দিলুম।'

গাড়োয়ান আবার হেসে বললে, 'তুমি তো দিতে পারলে, কিন্তু আমি নিতে পারলুম না যে।'—বলে একটা সিকি সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দিলে।

সামনের গ্যাসের আলো গাড়োয়ানের মুখের উপর পড়েছিল এইবার। স্ট্যান্‌লি চমকে বললেন, 'এ কি, তুমি! তোমাকেই না এই মাত্র হারু বুড়োর ওখানে দেখলাম?'

'হ্যাঁ সাহেব, গাড়িও হাঁকিয়ে থাকি।'

স্ট্যান্‌লি কিছুক্ষণ কি ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

লোকটি একটু হেসে বললে, 'আমার নাম অশান্ত কর্মকার।'

তের

সতের বছরের ছেলে যখন বাংলার কোন একটা বিখ্যাত কলেজে ভর্তি হতে গেছল, তখন প্রিন্সিপাল কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবেদন-পত্রে

পিতার নাম লেখা হয়নি কেন? সতের বছরের ছেলের উত্তরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলেন কোনমতে—'আচ্ছা, কাল এস।'

সতের বছরের ছেলে বলেছিল, 'সারাজীবনে যা সঠিক জানতে পারিনি তা কোথা থেকে লিখব?' আর যাবার সময় বলে গেছল, 'ভয় নেই, কাল আর আসব না। কিন্তু একটা কল্পিত নাম পেলে 'আপনার বিবেকের এতটা দুক্কার হতো না বোধ হয়?'

তারপর সমস্ত পাঠ্য-জীবন ধরে বন্ধুদের শত অনুরোধে বিজ্ঞদের শত উপদেশেও সে কোনদিন এ কথাটা গোপন করতে চায়নি যে তার পিতার ঠিক নেই। বন্ধুরা বলত, গোপন না কর, সে কথাটা জোর করে প্রচার করবার দরকার তো কিছু নেই। কিন্তু অশান্তর ওই ছিল ধরন, সে বলত, 'সত্য কথাটা শুনতে সমাজের এত লজ্জা এত বুকব্যথা করে কেন, গায়ের ঘা আর কতদিন এমন করে ঢাকা রাখবে!'

* * *

তারপর যখন সে অক্সফোর্ডের এম. এ. ডিগ্রি পেয়ে ইকনমিক্সে প্রথম স্থান নিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকেই লেকচারের পদ গ্রহণ করবার নিমন্ত্রণ পেলে তখন কেউ ভাবেনি যে সে অমন করে সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে চলে আসবে। কেউ ঠিক করলে, নিজের দেশের ছেলেদের ছেড়ে পরের দেশের ছেলেকে পড়াতে রাজী নয় বলেই বোধ হয় সে প্রত্যাখ্যান কবেছে। আধুনিক য়ুরোপের প্রখ্যাত রাজনীতিক মনীষীদের সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্কের বহর থেকেই দেশ তার শক্তির কিছু নমুনা পেয়েছিল। তার গত জীবনে যত জঞ্জালই থাক দেশ তাকে উপেক্ষা করতে পারে না এমন সময়ে। যে বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপালকে একদিন সে স্তম্ভিত নির্বাক করে দিয়ে এসেছিল, সেই কলেজ থেকেই তাকে সাদরে আহ্বান করে পাঠালো তার উত্তর অশান্ত কর্মকার যা দিলে তা অদ্ভুত।

অশান্ত লিখলে, 'গরুর চেয়ে ঘোড়া চালানটাই বেশি পছন্দ হলো। একটা ঘোড়ার গাড়ি কিনে ফেলেছি—মার্জনা করবেন।'

অবশ্য ছাত্ররা যে সব গরু এমন ধারণা অশান্তর ছিল না কিন্তু খোঁচা দিতে পারলে অশান্ত কিছুতেই ছাড়তে পারত না। চেষ্টা করেও সে নিজের মনের এই আঘাত করবার দুরন্ত জ্বালাময় প্রবৃত্তি দমন করতে পারত না। তার মুখ থেকে বা কলম থেকে একটু বিষ না নিয়ে কোন কথা বেরুতে চাইত না।

সেবার মস্ত এক স্বদেশী সভায় তাকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। দু-একজন বক্তা দেশ সম্বন্ধে নানা মর্মস্পর্শী কথা বলার পরে অশান্ত যখন উঠেছিল তখনকার হাততালির বহর দেখে কেউ ভাবেনি খানিক বাদেই সে-হাততালির অমন পরিণাম হবে।

অশান্ত কর্মকার বলেছিল, 'আমি এ পর্যন্ত যা শুনলুম তাতে মনে হয় আমি যা বলব তা সকলের মুখরোচক হবে না। আপনাদের সভার কার্যকলাপ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে এই সভা করা ও স্বদেশী বক্তৃতা দেওয়া আপনাদের থিয়েটার যাত্রা গান ইত্যাদির মতো একটা নূতন ধরনের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সমবেত লোকেরা তখনও রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনছিল, তারা থ' হয়ে গিয়েছিল। অশান্ত আরো বললে, 'এখানে যাঁরা দেশ দেশ বলে চীৎকার করছেন ও করবেন তাঁরা যে দেশের 'দ'র জন্যেও কেয়ার করেন না এবং দেশ সম্বন্ধে তাঁদের দুর্ভাবনা যে কতটুকু তা আমি ভাল রকমই জানি। তা ছাড়া তাঁদের চিন্তা করারই ক্ষমতা নেই।'

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'আপনি বসে পড়ুন।'

অশান্ত বলে যেতে লাগল, 'তাঁরা মুখস্ত বুলি আউড়ে চলেছেন—দেশ উদ্ধার কর, দেশের উন্নতি কর, স্বরাজ দাবী কর,... দেশের সত্যিকারের উন্নতি করতে গেলে আগে দরকার পরসাহায্যপুষ্ট অকর্মণ্য পরগাছাদের সমূলে উচ্ছেদ। কিন্তু সে কথা বলার সাহস তো দূরের কথা ভাবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তা ছাড়া কোথায় দেশ? আমি তো পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই, জাতি নেই,—শুধু আছে দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে, আর একটা যারা পৃথিবী জুড়ে এই পরগাছাদের রসদ যোগায় আপনাদের কল্‌জের রক্ত দিয়ে। আমার কাছে দেশ নেই, স্বদেশীর হুজুক বুজরুকি...'

চারিদিকে রব উঠল, 'সেম্‌! সেম্‌!' 'বসিয়ে দাও', 'দূর করে দাও।' অশান্ত বলে যেতে লাগল, 'এই সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া বড়মানুষের বাজে বিলাস। আমি দেখছি উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক, অবিচারী আর যারা অবিচার সয়, এই দুটো দল। এই দুটো দলের মৌখিক সংযোগ থাক আর না থাক নাড়ীর সংযোগ আছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই এক দলকে পায়ের তলে রেখে তাদের রক্ত শুষে নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র চলেছে আরেক দলের—কম আর বেশি—'

সভায় গোলমাল অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'পাগলের প্রলাপ শুনতে আসিনি মশাই।'

সভাপতি একটা কাগজে লিখে পাঠালেন, 'আপনার কথা শুনতে অনেকে চাচ্ছে না, আপনি বসলে বোধহয় ভাল হয়।'

অশান্ত কাগজটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলে বলে যেতে লাগল, 'দেশ দেশ করে চেঁচালে দেশের উন্নতি হয় না। আর যদি বা দেশ এই চীৎকারেই হঠাৎ স্বাধীন হয়ে পড়ে তাতে কি লাভ? মজুরের মুখের তাতে পুষ্টিকর উপকরণ কতটুকু বাড়বে? চাষার ভাঙা চালায় ক'টা ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির জল আর শীতের হাওয়া আসা নিবারণ হবে? কুলির কদর্য, নোংরা, মানুষের বাস করার অযোগ্য বস্তির কতটুকু শ্রী ফিরবে? আজকের এই উপবাসী অতিশ্রমক্লিষ্ট জীর্ণদেহে ভগ্নস্বাস্থ্য উৎপীড়িতদের অন্ধকার জীবনে কতটুকু আলো আসবে! নোংরা ছোটলোকদের ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে তেমনি অক্ষম ধনীর প্রাসাদ উঠবে তাদের জীর্ণ কুড়েকে ব্যঙ্গ করে। তেমনি চলবে দেশ জুড়ে অত্যাচারিতের মুমূর্ষু বুকের ওপর প্রবলের বিলাসনৃত্য। কি মূল্য স্বাধীনতার? আগে এই বিশ্বজোড়া অন্যায়ের, এই অবিচারের···।'

সভায় কোলাহল এত বেড়ে উঠল যে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব। সভাপতি নিজে উঠে অশান্ত কর্মকারকে বসতে অনুরোধ করলেন।

সেদিন সভা থেকে বেরিয়ে আসার পর অশান্ত কর্মকার আর কোন স্বদেশী সভায় যায় নি। কিন্তু তার মত প্রচার করতে একদিনও সে পেছপাও হয় নি।

বন্ধুদের কাছে সে বলত, 'কোথায় গলদ তা আমি বেশ বুঝি, কিন্তু পথ যে কোন্ দিকে তা আজও ভাল করে ঠিক করতে পারলুম না। যুগ যুগান্তরের অবহেলায় এই অন্যায় আজ তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নিয়ে এত বিপুল হয়ে পড়েছে ও তার সঙ্গে আমাদের আজকের জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ জড়িয়ে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, তাকে সমূলে উৎপাটন করা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি হয়তো নিষ্ফল। রোগ আমাদের সমাজদেহে এমন করে ছড়িয়ে গেছে যে, রোগের প্রতিকার করতে গেলে রোগীরও বুঝি প্রাণ যায়। সত্যি-ই এ সমস্যার না সমাধান করলে সমস্ত মানুষ জাতটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে।'

বন্ধুরা শুনে হেসে বলত, 'ওই কুলিদের নোংরা বস্তির ভেতর যে দুর্নীতির, যে ব্যাধির, যে পাপের বীজ বাড়ছে তার সমাপ্তি কি এই কুলিদের মধ্যেই হবে ভেবেছ? কখ্খনো না। ওই পচা বদ্ধ জলে যে বিষকে বাড়ার প্রশ্রয় সমাজ আজ দিচ্ছে তারই জ্বালায় ক্রমশঃ সমস্ত সমাজ উজাড় হয়ে যাবে। যে-অনুপাতে

ছোটলোকে আর বড়লোকে প্রভেদ বাড়ছে শুধু সেই অনুপাতেই কিছুদিন বাড়লেই তো সমাজের এক অংশ মরবে অতিরিক্ত আয়েসে জীবনীশক্তিতে ভাঁটা পড়ে, আর এক অংশ মরবে অতিরিক্ত দুঃখ-দুর্দশার গুরুভারে। এক এক সময় হতাশ হয়ে ভাবি সত্যিই বুঝি এ সমস্যার কোনদিন সমাধান হবে না।'

চোদ্দ

বর্ষায় সমস্ত মুচিপাড়াটার জলে কাদায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে এক পা-ও কাদায় না-পড়ে যাবার উপায় ছিল না। অধিকাংশ ঘরের ভেতরকার অবস্থা বাইরের চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না। সমস্ত মাটির মেঝে ফুঁড়ে জল ওঠার দরুন ঘরের মধ্যে শোয়া-বসা অসম্ভব হলেও উপায় তা ছাড়া নেই। পুকুরের পাশেই যাদের ঘর, বৃষ্টির জলে পুকুর ভরে উঠে তাদের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত চড়াও হয়েছে। চারিদিকে পচা গাছপালার একটা দুর্গন্ধ, বাতাস ভারী করে তুলেছিল। তারি মাঝে উলঙ্গ গুটিকতক ছেলেমেয়ে ময়লা দেহে কাদায় গড়াগড়ি করে খেলা করছিল।

কালাচাঁদ ঘরের ভেতর থেকে বললে, 'আজ আর রাঁধবি কি করে, বাইরে ওই জলের ওপর ?'

পাঁচি ভিজে কাঠের অজস্র ধোঁয়ায় অস্থির হয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'উনুনই তো ধরল না।'

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল ; কালাচাঁদের ঘরের চাল ফুঁড়ে তার ঝাপটাও মাঝে মাঝে ভেতরে আসছিল। 'বৃষ্টি তো আর থামছে না। আজ আর তবে রেঁধে কাজ নেই।'

'খাবে কি তাহলে ?'

'দুটো মুড়ি আর তেলেভাজা নিয়ে আসি না হয়।'

ভিজে কাঠকে কোন রকমে দুরস্ত করতে না পেরে পাঁচি বললে, 'তাই যাও, এ উনুন আর ধরবে না। ঘরে কি একটা জায়গা শুকনো আছে যে কাঠ রাখব।'

কালাচাঁদ বেরিয়ে এসে বললে, 'দে তবে ছ'টা পয়সা।'

পাঁচি তিনটে পয়সা একটা ভাঙা বিস্কুটের টিন থেকে বার করে দাদার হাতে দিয়ে বলে, 'ওই তিন পয়সা হলেই হবে।'

'তিন পয়সায় দু-জনের কি হবে রে ?'

'আমার তো কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে, এ বেলা উপোস দেব।'

পাড়ায় ক'দিন থেকে একটা বিশ্রী জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। চার-পাঁচজন এর মধ্যেই মারা গেছল।

কালাচাঁদ ভীত হয়ে বলে, 'এতক্ষণ বলিস নি কেন? ওই জ্বরের ওপর আবার তুই জলে ভিজে রাঁধতে গেছলি।'

'তা কি হবে?'

'তা কি হবে? গগনের মেয়েটা অমনি করে জ্বরের ওপর জলে ভিজেই তো মারা গেল। কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল তো সমস্ত রাত এই ভিজে মেঝেয় পড়েছিলি কেন?'

পাঁচি কোন উত্তর দিলে না।

'যা খুশি কর বাপু—ভাল লাগে না আর আমার'—বলে কালাচাঁদ বেরিয়ে গেল।

পাঁচি সমস্ত বুকে-পিঠে অসহ্য বেদনা অনুভব করছিল। মাথাটা ভার হয়ে চোখ দিয়ে যেন তার আগুন বেরুচ্ছে; সে গিয়ে কালাচাঁদের ঘরে একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। গত দু-তিন দিন তার চোখের ওপরই এইরকম জ্বর হয়ে দেখতে দেখতে ক-জনা মারা গেছে। সুতরাং মরণের সম্ভাবনা তার মনকে একেবারে বিচলিত করেনি এমন নয়, কিন্তু তার চিরবঞ্চিত আশাহীন জীবনে মৃত্যুর কাছ থেকে আর ভয় করবার কি ছিল?

কালাচাঁদ কোঁচড়ে করে মুড়ি আর তেলেভাজা এনে, মুখ ভার করে রান্না-ঘরের চৌকাঠে বসে খানিক সেগুলো নীরবে চিবিয়ে হঠাৎ আপন মনে গুমরাতে আরম্ভ করলে।

পারব না আমি রোজ রোজ রোজ এই নিড়োনা মুড়ি চিবুতে—কেন, 'আমি কি রোজগার করে আনি না?'

পাঁচি জ্বরের যন্ত্রণার মাঝে দাদার এই অন্যায় কথাবার্তায় যোগ দিল না।

কালাচাঁদ আবার আরম্ভ করলে—'কেন, আমি মুড়ি খেতে যাব, ভাত রাঁধার লোক কি আমি রাখতে পারি না?...এই যে এখন তোর জ্বর হলো জলে ভিজে ভিজে, এখন তোকেই বা কে দেখে আর আমাকেই বা কে দেখে! মুড়ি খেয়ে কি মানুষ থাকতে পারে রোজ-রোজ!'

এবার পাঁচি আর কথা না-কয়ে পারলে না।

'ক-দিন তোমায় মুড়ি খেয়ে থাকতে হয়েছে দাদা? আজ তো এই জ্বর নিয়ে রাঁধতে গেছলাম, ভিজে কাঠ ধরল না—সে আমার দোষ...'

কালাচাঁদ বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'কেন তুই জ্বরের ওপর জলে ভিজে

রাঁধতে গেছলি! এ তো আর কিছু নয় শুধু আমাকে জব্দ করার মতলব। এখন আমি গরীব মানুষ, ডাক্তার বদ্যির খোরাক যোগাতে হয়রান হই, তাই তো তুই মজা করে দেখতে চাস?'

'আমার জন্যে তোমার বদ্যি আনতে হবে না দাদা, আমি অমনিই মরতে পারব।'

কালাচাঁদ চটে উঠে বললে, 'না বদ্যি আনতে হবে কেন? জলে ভিজে ইচ্ছে করে জ্বর এনেছিস, এখন বদ্যি আনতে মানা করবি বই কি! নইলে মরে আমার সর্বনাশ করবি কি করে!'

দাদার এই অনর্থক কুঁদুলেপনায় বিস্মিত হয়ে পাঁচি বললে, 'এ তো ভারী মুশকিল দেখছি, রাঁধতে পারিনি বলে মুড়ি খেতে হচ্ছে, তাই নিয়ে একবার বকাবকি করলে, আবার এখন বলছ কেন রাঁধতে গেছলাম! কি করলে ভাল হতো তা তো বুঝলাম না...'

'কি করলে ভাল হতো তা আর কতবার করে বলব!'

কালাচাঁদ ভুক্তাবশিষ্ট মুড়ি একটা পাত্রে রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর কাজে বেরুবার জন্যে গামছাটা কাঁধে ফেলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আবার কি মনে করে পেছন ফিরে বললে, 'আমার কথা রাখলে আজ তোকে জ্বর নিয়ে রাঁধতে যেতে হয়, না, আমায় শুকনো মুড়ি চিবিয়ে কাজে বেরুতে হয়!'

তারপরে আর-একটু এগিয়ে পাঁচির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অর্ধেক মিনতি ও অর্ধেক রাগের স্বরে বললে—

'একটা লোক নিজে থেকে সংসারে আসতে চাইছে, তাতে সংসারের আয় বাড়বে, তোর কাজের ঝঞ্ঝাট কমবে, তাতে তোর আপত্তি কেন শুনি?'

এতক্ষণে দাদার কুঁদুলেপনার অর্থ বুঝতে পেরে পাঁচি বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ করে কাঁথাটা ভাল করে গায়ে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুল।

কালাচাঁদ খানিক দরজাটা ধরে উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট-দুই-তিন বাদেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে—'তুই কি একটা কথার উত্তর দেওয়াও জালা মনে করিস পাঁচি?'

জ্বরের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছিল। পাঁচি মুখটা কালাচাঁদের দিকে ফিরিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলে, 'ও-কথার উত্তর তো অনেক বারই দিয়েছি দাদা। ও কি জাত তার ঠিক নেই, পঁচিশ বছরের একটা মাগীকে ঘরে আনার কথা বার বার বলতে তোমার লজ্জা হয় না দাদা! আমাদের বংশে কখনো অমন অনাচার হয়েছে?

নফর তার মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে, তুমি রাজী হও, আমি এক মাসের মধ্যে পিরতিমের মতো বৌ ঘরে আনছি—'

'ওঃ—তাহলে তো আর সোয়াস্তির শেষ থাকে না! আমাদের কে দেখে তার ঠিক নেই আবার একটি কচি বাচ্চাকে মানুষ কর!'

'সে মানুষ তো আর তোমায় করতে হবে না দাদা, আমি করব।'

'তা হলেই সব ঝঞ্চাট কমে যাবে! তোর অসুখ করলে আরো ভাল করে সংসার চলবে! আমি ও-সব বাজে কথা আর শুনতে চাই না, কালই আমি নেত্যকে নিয়ে আসব, দেখি তুই কি করতে পারিস!'

তার হৃদয়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও সংস্কারের এই বিরুদ্ধাচরণে একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে পাঁচি আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বললে, 'আমি কাল থেকে জীবনের মা-র কাছে গিয়ে থাকব দাদা।'

যে সংস্কারের জোরে সে তার ব্যর্থ যৌবনের সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা ও সমস্ত কামনাকে অস্বীকার করে আপনাকে নির্মমভাবে বঞ্চনা করেছে, যে সংস্কারের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা তার নিরর্থক জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা ও কৈফিয়ৎ—সে সংস্কারের অসম্মান সে যে কিছুতেই সইতে পারে না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, 'তোর যে চুলোয় ইচ্ছে যাস'—বলে কালাচাঁদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ বাদেই অর্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বলে গেল, 'আজ কিন্তু যদি বাড়ি থেকে এক পা বাড়াস তো আমার মরা মুখ দেখিস।'

পনের

এবার বর্ষায় মুচিপাড়া ও তার পাশের মেথর-বস্তির অশোভন ও বোধহয় অনাবশ্যক জনসংখ্যা-সমস্যার মীমাংসা করার ভার নিয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা ও তারই নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় কয়েকজন জ্ঞাতি-গোত্র। সে ভার-নির্বাহে তাদের আলস্য ছিল না।

স্ট্যান্‌লি সাধ্যমতো সন্ধান নিয়ে ঔষধ বিতরণ ও পরিচর্যা করে গভীর রাত্রে মুচিপাড়া ও মেথর-বস্তির মাঝের কর্দমাক্ত একটা গলি দিয়ে ফিরছিলেন। নামে পথ হলেও সেটা দুই সার বস্তির মধ্যে খানিকটা অপরিসর কর্দম-ভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকারে সামনে একরকম হাতড়েই চলতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাদা থেকে পা টেনে তুলতে রীতিমতো লড়াই করতে হয়।

খানিকদূর যাবার পর হঠাৎ অন্ধকারে কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্ট্যান্‌লি দাঁড়িয়ে পড়লেন। অপর লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ল। গাঢ় অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হলো যেন লোকটির কাঁধে কি একটা বিশেষ ভার আছে। এই পথেরই মতো ডানদিকের আর একটি পথ দিয়ে লোকটি এসেছে বোঝা গেল; কিন্তু তার কাঁধের বোঝাটি যে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে স্ট্যান্‌লির কল্পনা তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারল না। এত রাত্রে এই অন্ধকার গলিতে এ-রকম ধরনের রহস্যময় বোঝা তাঁকে একটু কৌতূহলীই করে তুললে।

কিন্তু প্রশ্ন করার আগেই লোকটি আবার চলতে শুরু করলে, তার দ্রুত-গতির অনুসরণ করা একটু কষ্টকর হলেও স্ট্যান্‌লি তার পিছু-পিছু চললেন।

খানিকদূর এমনি করে যাবার পর স্ট্যান্‌লির মনে হলো এ অনুসরণ তাঁর বৃথা, এ কৌতূহল তাঁর অন্যায়। পাহারাওয়ালা হবার সময় ও শক্তি তাঁর নেই, সুতরাং অদ্ভুত লোকটির ওই বোঝার সঙ্গে যে রহস্যই জড়িত থাক না, তার উদ্‌ঘাটন-চেষ্টায় নিজের অযথা .কৌতূহল-নিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কিন্তু স্ট্যান্‌লি তাঁর দ্রুতগতি মন্দ করতে-না-করতেই সামনের লোকটি তার দ্রুতগতি না কমিয়ে ও মুখ না ফিরিয়েই তাঁকে থামতে নিষেধ করলে।

'থামবেন না সাহেব, একটু দরকার আছে।'

কর্দমাক্ত গলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সামনেই বড়রাস্তার গ্যাসের আলো দেখা যাচ্ছিল। লোকটি গ্যাসের আলোর সামনে কাঁধের বোঝাটি নামিয়ে রেখে স্ট্যান্‌লির দিকে ফিরে বললে—'আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন তো, আমার তো মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে।'

স্ট্যান্‌লি নীচের দিকে চেয়ে একবার অনিচ্ছায় শিউরে উঠলেন। এই বোঝা নিয়েই কিছুক্ষণ আগে যে সন্দেহ করেছিলেন, তার জন্যে একটু লজ্জিতও না-হয়ে পারলেন না। নত হয়ে খানিকক্ষণ নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

সামনে রক্ত ও কর্দমে মাখামাখি হয়ে যে মৃতদেহটি পড়েছিল, তার দিকে চাইলে প্রথমেই এই কথাটি মনে হয় যে দেবতা ও মানুষ মিলে আজীবন তাকে কোন লাঞ্ছনা, অপমান ও আঘাত থেকেই অব্যাহতি দেয় নি। যার বেদনাময় বার্ধক্য এমন অগৌরবে সমাপ্ত হলো নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে, তার যৌবন ও শৈশব গেছে কি নিদারুণ নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা ও হতাশা নিয়ে—এই মৃত বৃদ্ধার অষ্টাবক্র

কুৎসিত দেহের পানে চেয়ে স্ট্যান্‌লি বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন। পাশের লোকটির আহ্বানে তাঁর চমক ভাঙল।

'এখন এর সৎকার তো করতে হবে? আপনার একটু সাহায্য পাব কি?'

স্ট্যান্‌লি একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন—'আমার সাহায্য নিতে তোমার কোন আপত্তি নেই?'

লোকটি একটু হেসে বললে, 'না সাহেব, আপনার সাহায্য করতে কোন আপত্তি আছে কি?'

একটু ভেবে স্ট্যান্‌লি বললেন, 'আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এব আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করা তো আগে দবকার, তারা আপত্তি করতে পারে।'

'আমি একে চিনি সাহেব, এর কেউ নেই। আজ ঘটনাক্রমে পথের কাদায় আমার পায়ে না ঠেকলে যেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল, সেখানেই ঐ শব ক দিন পচতো বলা যায় না।'

'এ তো হিন্দু?'

লোকটি এতক্ষণ মৃতদেহের কাদা ও বক্ত কাপড় দিযে মুছছিল। দাঁড়িযে উঠে স্ট্যান্‌লিব দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, 'গবীব।'

'হিন্দু তো?'

'গরীবের নিজস্ব কোন ধর্ম আছে সাহেব, কোন জাতি-পবিচয়? তাকে কেউ হিন্দু বলে অভ্যাসে, কেউ তাকে খ্রীস্টান করে খেয়ালে, সে-ও নিজেকে তাই বলে জানে। কিন্তু সেকথা যাক সাহেব, আপনার কোন আপত্তি নেই তো, তাহলেই হলো।'

'আমায় শ্মশানে যেতে হবে কি?'

'হ্যাঁ সাহেব, ভারতবাসীর মৃতদেহে তুমি বোধহয় তোমাদের জাতের মধ্যে প্রথম কাঁধ দিলে।'

স্ট্যান্‌লি একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের শ্মশানে আমার যেতে কোন বাধা নেই তো?'

আগে মত দিলেও স্ট্যান্‌লির মনে সংস্কারগত দ্বিধা একটু জাগছিল, বিশেষতঃ যাজকের পোশাকে এ-রকম শব বয়ে নিয়ে যাওয়াটা একটু অশোভন হবে বলে মনে হচ্ছিল।

লোকটি স্ট্যান্‌লির দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বললে, 'অত রাত্রে কেউ লক্ষ্য করবে না সাহেব।'—তারপর খানিক এগিয়ে আবার বললে, 'এদের আত্মা কি আলগোছে উদ্ধার করতে চান সাহেব?'

স্ট্যানলি মাথা নত করে ছিলেন, উত্তর দিলেন না।

*　　　*　　　*　　　*

ভোর হবার আগেই সৎকার শেষ হয়ে গেল। ঐ জীর্ণ দেহটুকু ছাই করতে অগ্নির কতটুকু সময় লাগে? স্ট্যান্‌লি গৃহের দিকে ফিরলেন। লোকটিকেও সঙ্গে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার গাড়ির আড্ডায় চললে নাকি?'

'সাহেব তাহলে আমাকে ভোলেন নি?'

স্ট্যান্‌লি শুধু 'না' বলে এগিয়ে চললেন।

লোকটি সঙ্গে চলতে চলতে বললে, 'এখন গাড়ির আড্ডায় আর যাব না সাহেব, আপনার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চাই—'

স্ট্যান্‌লি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা?'

'চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

দুজনে এগিয়ে চললেন, কিন্তু লোকটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বললে না। স্ট্যান্‌লি মনে মনে একটু অধীর হয়ে উঠেছিলেন এমন সময় লোকটি আরম্ভ করলে—'আপনার মনে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার নেই সাহেব—আপনার মত ও কাজের অনুমোদন না করলেও যে হৃদয়ের প্রেরণাতে আপনি এখানে কাজে নেমেছেন সে হৃদয়কে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু—'

লোকটি আবার চুপ করল। স্ট্যান্‌লি খানিক অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কি?'

লোকটি হাত দিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য কোন বস্তু যেন সরিয়ে দিয়ে বললে,—'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি সাহেব, ওই বাঁকাবুড়ীর শব আজ এই শ্মশানে না পুড়ে যদি গোরস্থানে যেত তাহলে এর মৃত্যু কিছু বেশি গৌরবের হতো কি?'

স্ট্যান্‌লি কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে লোকটি বলতে লাগল, 'ছেঁড়া নোংরা ধুতির বদলে ছেঁড়া নোংরা প্যাণ্টালুন পরালে এদের দুঃখ কতটুকু কমবে সাহেব, এদের জীবনব্যাপী দুর্দশা কি ঘুচবে একটুও? না সাহেব, ধর্ম নিয়ে আমি তর্ক করছি না। খ্রীস্টধর্ম শ্রেষ্ঠ কিনা তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই না—শুধু বলতে চাই যে এখানে হিন্দুধর্ম-খ্রীস্টধর্মের কথা আসে না, এখানে হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্ম মানে ছেঁড়া ধুতি আর ছেঁড়া প্যাণ্টালুন, শ্মশান আর কবর, এর বেশি কিছু নয়। আর ছেঁড়া ধুতির চেয়ে বোধ হয় ছেঁড়া প্যাণ্টালুন সস্তা ও সুবিধার নয়। গোর চিতার চেয়ে বেশি আরামের নয়! মানুষেরই ধর্ম থাকে, এরা মানুষ হোতে পেল কবে?'

স্ট্যান্‌লি মাথা নত করে বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে নীরবে হাঁটছিলেন, কোন কথা বললেন না।

লোকটি আবার আরম্ভ করল,—'যদি পৃথিবীর খ্রীস্টানদের সংখ্যার অঙ্ক বাড়ানোই আপনার অভিপ্রায় হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই সাহেব, কিন্তু যদি জীবনের অপমান, এই কুৎসিত দৈন্য, এই বীভৎস বিকার আপনাকে পীড়িত করে থাকে, যদি সত্যিই এদের কল্যাণ-ই আপনার লক্ষ্য হয়, তাহলে একথাগুলো ভেবে দেখবেন।'

অন্ধকার প্রায় কেটে গেছল। দুজনে নীরবে নির্জন পথ দিয়ে চলতে লাগলেন।

স্ট্যান্‌লি হঠাৎ লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার সঙ্গে এই সব কথা আলোচনা করার এখন বিশেষ সুবিধে হবে না, আপনি যদি আপনার ঠিকানা দেন, আমি একদিন দেখা করতে পারি।'

লোকটি হেসে বললে, 'আমার কোন ঠিকানা নেই সাহেব, আমিই একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করব গিয়ে।'

ষোল

ছেঁড়া গামছাটা মাথায় দিয়ে কালাচাঁদ যখন কাজের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলো তখন হাজিরার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে কনট্রাক্টরের অধীনে তার কাজ, তাঁর কড়া নিয়ম সে ভালোরকমই জানত, তাই পথে মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও সে কোথাও দাঁড়াতে সাহস করেনি। তবু সময়মতো হাজিরা দেওয়া হলো না।

মুলো সর্দার সামাদ হাঁকলে, 'একশো তের নম্বর কালাচাঁদ মিস্ত্রী, পোনের মিনিট লেট।'

পথে কোথাও না দাঁড়ালেও লেট হওয়ার তার কারণ ছিল। নিজের অজ্ঞাতে সে সমস্ত পথ যে গতিতে এসেছে, তা তার স্বাভাবিক গতি নয়। সে গতিতে চার মাইল পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে সময়মতো হাজিরা দেওয়া চলে না। যন্ত্রের মতো সমস্ত পথ পা চালিয়ে এলেও কাজের কথা তার মনে ছিল না।

এতদিন তার আশা ছিল, পাঁচি হয়ত কোন-না-কোন দিন মত দেবেই। এখন কিছুদিন আপত্তি করলেও চিরকাল এমন করে তার অনুরোধ ঠেলতে পারবে না, কিন্তু আজ পাঁচির আচরণে সে এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, পাঁচি

মরে গেলেও নেত্যকে ঘরে আনার মত দেবে না। পাচি সে বিষয়ে পাহাড়ের মতো অটল। এখন হয় তাকে বোনকে ছাড়তে হয়, নয় নেত্যকে ঘরে আনার আশা একেবারে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কোনটাই যে তার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত রাস্তা সে এই কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছে।

মেজেয় সীমেণ্ট দিতে দিতেও সে সেই কথাই ভাবছিল। পাঁচিকে ফেলে নেত্যকে নিয়ে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু নেত্যকে ছেড়ে দিলে যে কিছুই থাকে না জীবনের।

'হাতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে, হাত নড়ছে না কেন ?'—

*   *   *

প্রকাণ্ড ইমারত তৈরি হচ্ছে। সবসুদ্ধ একশো পঁচিশ জন মিস্ত্রী খাটে, আর দেড়শো মজুর মজুরণী। নেত্য ও কালাচাঁদ একসঙ্গেই এখানে কাজে ভর্তি হয়, কিন্তু বেশিদিন দুজনে কাছাকাছি কাজ করতে পায়নি। কাছাকাছি নম্বর হবার দরুণ আগে এক কাজেই দুজনে থাকলেও কিছুদিন পরে নেত্যর প্রতি সুরকীকলে যোগাড় দেবার আদেশ হয়। আজকাল জলখাবার আর ছুটির সময় ছাড়া তাদের বড় একটা দেখা হয় না।

এই দু-জনকে পৃথক করার মধ্যে কারুর কোন কারসাজি ছিল এমন সন্দেহ করা হয়তো অন্যায়, কিন্তু কালাচাঁদের সে সন্দেহ ছিল। নুলো সামাদকে সে ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে না-দেখে পারত না। সামান্য মিস্ত্রী থেকে সামাদ এখানকার সর্বেসর্বা পদে উঠেছে। ডান হাতটা তার ছিল না। এই ছিন্ন বাহুর কি একটা ভয়ঙ্কর ইতিহাস নাকি আছে সঙ্গী মিস্ত্রীদের ইঙ্গিতে সে মাঝে মাঝে তার আভাস মাত্র পেত। কিন্তু ডান হাত না-থাকলেও সে কেমন করে কনট্রাক্টরের ডানহাত হয়ে উঠেছিল, সে কাহিনী আর অজ্ঞাত ছিল না। এই কনট্রাক্টরের সৌভাগ্য-সম্পদ নাকি এই অঙ্গহীন লোকটির অমানুষিক হৃদয়হীনতা নিষ্ঠুরতা ও কূটবুদ্ধির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, এখন এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তাঁর একমাত্র কাম্য হলেও তিনি সামাদকে ছাড়তে পারছিলেন না। তার ঔদ্ধত্য অসহ্য। মিস্ত্রী মজুরদের সামনেই সে তার প্রতিবাদ করে তাঁকে অমান্য করে বাহাদুরি দেখাত।

নেত্য ও কালাচাঁদের ঘনিষ্ঠতা যে সামাদের চোখ এড়ায়নি কালাচাঁদ তা বুঝেছিল, কিন্তু তাদের পৃথক করার ভেতর তার কোন স্বার্থ সে খুঁজে পেত না। তবে আজকাল যেন সামাদের দৃষ্টি তার দিকেই একটু বেশি, সর্বদাই সে যেন তাকে অপমান করার ছুতো খুঁজে বেড়ায়—

'এটা কার গাঁথুনি? কালাচাঁদের বুঝি? কিছু হয় নি—ভেঙে ফেলে নতুন করে গাঁথ—'

'কি এমন লাটসাহেব মিস্ত্রী, তাগাড়টা নিজে আনতে পার না, না পার তো কাল থেকে কাজে এসো না।'

কোনদিন কালাচাঁদ এর অর্ধেক অপমানও সইতে পারতো না, কিন্তু অনেকবার মাথা ঠুকে তার এতদিনে বোধহয় সুবুদ্ধি হয়েছিল। সে আজ-কাল নত হয়েই থাকে। তবে চোখ দুটো অবাধ্য, ঘৃণায়-ক্রোধে তা থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে। সেই নিরুপায় নিষ্ফল ক্রোধটুকু বোধহয় সামাদ উপভোগ করতো।

কালাচাঁদ ক্ষিপ্রতর হাতে কাজে মন দিলে। সুখভোগ করার সময় হয়তো তার নেই—কিন্তু দুঃখের চিন্তার অবকাশও যে নেই এ কি কম সুবিধা!

ইমারতের লাগাও সুরকির কল। অত বড় বাড়িতে প্রচুর সুরকীর প্রয়োজন। এত অধিক পরিমাণ সুরকী কেনার চেয়ে তৈরি করাতে লাভ বেশি বলে কনট্রাক্টর নিজেই এটা অস্থায়ীভাবে বসিয়েছেন। জলখাবারের ছুটি হয়েছিল। কালাচাঁদ সম্প্রতি কাজ রেখে তেতলা থেকে নেমে এল নেত্যর খোঁজে। মজুরণীরা রাস্তার কলের চারিধার ভিড় করে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। নেত্যর হাত-পা ধোয়া সবে হয়েছে, কোমরে জড়ানো গামছা খুলে সে হাত-পা মুছছিল কালাচাঁদকে দেখতে পেয়ে সে একটু হাসলে।

'যা লো, তোর আর এক পেয়ারের লোক এয়েচে, আমায় বাপু একটু দোক্তা দিয়ে যা।'

পাশের প্রৌঢ়া মজুরণী বোধহয় পানে ও দোক্তাতেই কালো দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বার করে হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে। নেত্য একটা উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন ঝগড়া বাধালে মিছিমিছি খানিক সময় নষ্ট হবে জেনে উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

'ও মা, তেজ দেখেচ, একটু দোক্তা চেয়েচি তাতেই এত?'

একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় ইঁট ভেজাবার বন্দোবস্ত ছিল। সেইখানটায় জলখাবারের সময় তারা রোজ গিয়ে বসতো। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন বলে কথা কইবার সুবিধে ছিল।

প্রথম কিছু অবান্তর কথার পর নেত্য বললে, 'শ্রাবণ মাসের পনের দিন এখনো বাকী, আমার কিন্তু আর একদিনও একা থাকতে ইচ্ছে নেই, মনে হয় আজই যাই।'

কালাচাঁদের দিকে ফিরে সে হাসতে লাগল।

নেত্যকে ঘরে আনা যে পাঁচির মোটেই অভিপ্রেত নয় সে কথা কালাচাঁদ নেত্যকে জানাতে পারেনি সঙ্কোচে। তাছাড়া তার আশা ছিল শেষাশেষি পাঁচির মত হবেই; কিন্তু আজ তার মনে হলো এমন করে নেত্যকে ভুল বুঝতে দেওয়া আর উচিত নয়। কালাচাঁদ পাঁচির মতের আশায় এতদিন ধরে ক্রমাগত নানা ছুতোয় নেত্যর আসার দিন পেছিয়ে দিয়েছে, কিন্তু দিন পেছুনো আর চলে না এবং নেত্যকে পাঁচির অমতে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কিন্তু কেমন করে নেত্যর কাছে পাঁচির অমতের কথা পাড়বে ও এতদিন সে-কথা গোপন করার কি কৈফিয়ৎ দেবে কালাচাঁদ ভেবে পাচ্ছিল না।

কালাচাঁদকে চুপ করে থাকতে দেখে নেত্য আর একটু কাছে সরে গিয়ে বললে, 'তোমার কি অসুখ করেছে নাকি গা?'

কালাচাঁদ শুধু মাথা নেড়ে জানালে, 'না।'

'তবে কথা কইচ না যে—'

'অমনি ভাবছি!'

'আর অত ভাবে না, ভেবে তো সব হবে!' তারপর উৎসাহের স্বরে নেত্য বললে, 'আমার রোজ বেড়েছে জান তো? যাই বল বাপু, সামাদ্ সর্দাব লোক ভাল, এবার থেকে পুবোপুরি একটাকা দেবে বলেছে, বলে, কাজ যে বেশি করবে তাকে কেন বেশি রোজ দেব না? আমি তো মানুষ দেখি না, আমি কাজ দেখি, ঠিক কথাই তো··'

কালাচাঁদ কি বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করে নিলে।

যে গভীর আশঙ্কা তার মনে জাগছিল, তাকে কেমন করে নেত্যর কাছে সহজভাবে প্রকাশ করে যেতে পারে!

নেত্য উৎসাহিত হয়ে বলে যাচ্ছিল, 'তুমি অত ভয় পাও কেন বল তো? আমাদের দুজনের কি এত খরচ যে তুমি ভয় পাচ্ছ, যা আমি রোজগার করব তোমার আয়ের সঙ্গে সেটা যোগ হবে। আর যদি তুমি অমনি একটা বিয়ে করতে? তিনটা পেট তো তোমার ওই আয়েতেই চলতো? লোকের তো তাও চলছে। ষষ্ঠীর তিনটে মেয়ে-বৌ নিয়ে যদি চলে, তোমার চলবে না?'

হঠাৎ কালাচাঁদের পাঁচির অসম্মতি ও নিজের হৃদয়ের গভীর আশঙ্কার চেয়ে জরুরী একটা কথা মনে পড়ে গেল। পাঁচির সঙ্গে এ-কথা নিয়ে বহু

কলহ তার হয়ে গেছে, তবু এ কথাটা—সে বোধহয়—শুধু নেত্যকে অকারণ আঘাত থেকে বাঁচার জন্যেই জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু আজ যখন আঘাতের ভয়টুকু উপেক্ষা না করলে কোন সত্য কথাই সত্য করে জানার বা জানাবার উপায় ছিল না, তখন মূল কথাটির জন্যেই আঘাতের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা সবচেয়ে সমীচীন মনে হলো।

কালাচাঁদ কথাটাকে গুছিয়ে ও কোমল করে বলার নানা বিফল চেষ্টা করে অবশেষে হঠাৎ বলে ফেললে, 'আমাদের বিয়ে কিরকম হবে নেত্য?'

অপটু কালাচাঁদের মনের এই কথাটিকে সহজ বলার চেষ্টায় কি দুরবস্থা যে হয়েছিল তা অবশ্য নেত্যর জানা ছিল না। সে ভ্রূকুটি করে ঈষৎ হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'আহা, ঠাট্টা করা কেন?'

কালাচাঁদ বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে বললে, 'ঠাট্টা তো করিনি।'

'না, ঠাট্টা নয়! বিয়ে আবার কি?'

'বাঃ, বিয়ে নয় তো কি শ্যাল-কুকুরের মতো ঘরকন্না হবে নাকি?'

কালাচাঁদের মুখের অটল গাম্ভীর্যে একটু বিস্মিত ও বিচলিত হলেও এসব কথাকে পরিহাস ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে নেত্য পারে নি। সে ঈষৎ বিরক্ত মুখে বললে, 'যাও, ইয়ার্কি ভাল লাগে, না, বিয়ে আবার হবে কি করে?'

'আবার মানে? বিয়ে কি তোমার হয়েছিল নাকি?'

কালাচাঁদ আর যাই করুক, পরিহাস যে করছিল না, সে বিষয়ে নেত্যর এখন আর কোন সংশয়ের সুযোগ রইল না। কালাচাঁদের মুখ যেন কোন অসহ্য বেদনায় বিবর্ণ হয়ে এসেছিল।

নেত্য ভীত হয়ে বললে, 'হয়েছিল তো, কিন্তু সে কি আর বিয়ে! সে তো মা-র মুখে না শুনলে আমি জানতেও পারতাম না—কেন, তুমি জানতে না?'

কালাচাঁদ অস্ফুটস্বরে বললে, 'না, আমি ভেবেছিলাম—' কিন্তু সে কিছুই ভাবেনি—তাই কথার মধ্যপথে থেমে সে অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

সে পাঁচির সঙ্গে নেত্যর কথা নিয়ে তর্ক করেছে বটে এবং যে তার ঘরণী হবার অযোগ্য নয়, সে কথা বার বার গলার জোরে প্রমাণও করেছে। কিন্তু সে প্রমাণ করার জন্য যুক্তি বা তথ্য কিছুরই সহায়তার প্রয়োজন হয় না—তার জন্যে ভাবতে হয় না। তা ছাড়া যে দুটি কারণ দেখিয়ে পাঁচি এ বিয়েতে আপত্তি তুলেছে তার একটি অর্থাৎ বয়স সম্বন্ধে যে কোন কারণেই হোক কালাচাঁদের মন সংস্কারমুক্ত ছিল। পাঁচির দ্বিতীয় আপত্তি, নেত্যর জাতিগত হীনতায়

কালাচাঁদ বিশ্বাস করত না, যদিও সে সম্বন্ধে নেত্যকে সে এতদিন আঘাত দেবার ভয়ে প্রশ্ন করে উঠতে পারে নি। এই বয়স ও জাতির বাধার অতিরিক্ত কোন কথা চিন্তা ও কল্পনা করার সময়, শক্তি বা উৎসাহ কিছুই তার ছিল না। আজ সেই জাতির কথাই সোজাভাবে জিজ্ঞেস করতে না পেরে ঘুরিয়ে বলার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বলেছিল, 'আমাদের বিয়ে কি রকম হবে নেত্য ?'

জাতিগত কোন বাধা যে তাদের বিয়েতে নেই এই সান্ত্বনাটুকুই যে আশা করেছিল নেত্যর মুখে। সেই উৎসুক প্রশ্নের এই নিদারুণ পরিণতিতে সে বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। তার সমস্ত দেহ ও মন নেত্যকে কামনা করে ; সেই কামনার প্রাবল্যে সে বয়সের সংস্কার ভেঙে ফেলতে পারে—এমন কি অপেক্ষাকৃত নীচু জাতি হলেও আপত্তি হয়তো না করতে পারে, কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান-বিনা সে এই বিধবা যুবতীকে কেমন করে গৃহে নিয়ে যায়, তাকে নিয়ে কেমন করে সংসার করে ? হাজার হলেও সে পাঁচিরই ভাই !

কালাচাঁদের মুখের এই আকস্মিক পরিবর্তনে একান্ত শঙ্কিত হয়ে নেত্য কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল—হঠাৎ অতি নিকটে মৃদু হাসির শব্দে দুজনেই চম্‌কে উঠল।

পেছনে দাঁড়িয়ে সামাদ হাসছিল—ক্রূর ব্যঙ্গের হাসি। সে হাসিতে তার কদর্য মুখের পৈশাচিক বীভৎসতা ভীষণতর হয়ে উঠেছিল।

তাদের মুখ ফেরাতে দেখে সে হঠাৎ বাঁ-হাতে মাথার কাপড়ের টুপিটা খুলে অপরূপ ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সেলাম করে বললে, 'কসুর মাপ করবেন, আপনাদের জলখাবারের ছুটি যে অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে সেই কথাটা জানাতে এলাম। একটু কষ্ট করে গা তুলবেন কি ?'

সতের

ছুটি হয়ে গেছল ; সুরকীর কলের মজুর-মজুরণীরা গায়ের ও কাপড়ের সুরকী ঝেড়ে বেরিয়ে পড়ছিল।

দোক্তা না দিয়ে তেজ দেখানোর জন্যে কাতি অর্থাৎ কাত্যায়ণী বুড়ী নেত্যর উপর বেশ একটু চটেই ছিল। জলখাবারের ছুটির পর সমস্ত বিকেল সে নেত্যর বিরুদ্ধে দল পাকানোর চেষ্টা করেছে। এখন কয়েকজন মজুরণীর সঙ্গে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফেরার মুখে পথের মোড়ে নেত্যকে দেখতে পেয়ে সে সকলকে একটু চোখ মটকে ইশারা করলে, 'এখনো দাঁড়িয়ে কেন লা, ঘর যাবি নে ?'

নেত্য অবশ্য দোক্তার ব্যাপার বিস্মৃত হয়েছিল। সে সহজভাবে উত্তর দিলে, 'একটু কাজ আছে ভাই।'

মুখটা তার যেন অত্যন্ত কাতর।

একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি সকলের মাঝে বিনিময় হয়ে গেল। একজন হঠাৎ কাতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তোর আজকাল এত কি কাজ লা? জলখাবারের ছুটির পর তো দেড়ঘণ্টা দেরি করে কাজে এলি, ছিলি কোথায়?'

সকলে মুখ টিপে হাসতে লাগল, কিন্তু কাতি বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুই সব তাতে আগে কথা কইতে আসিস কেন বল তো সখি? তোর বড় দোষ।'

কাতির বিরক্ত হবার কথা বটে! জলখাবারের ছুটি শেষ হবার পর নেত্যর অনুপস্থিতি কাতিই লক্ষ্য করেছে—এবং এই প্রশ্ন উত্থাপন করার কল্পনা ও প্রস্তাব সে-ই প্রথম করে। সুতরাং তার ন্যায্য অধিকার এই প্রশ্ন করার গৌরব চুরি করে বাহাদুরী দেখানো সে কেমন করে বরদাস্ত করতে পারে!

সখী কিন্তু কাতির বিরক্তিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত করে বললে, 'কেন, কইব না কেন! ভয় করি নাকি? না হয় আমাদের রোজ একটাকা নাই হলো, না হয় আমাদের ছেনালি নেই বলে কেউ খাতির করে না, না হয় আমাদের জলখাবারের দু-ঘণ্টা ছুটি মেলে না—'

কাতি আর সহ্য করতে পারলে না। তার বহু চেষ্টায় বহু যত্নে আহরিত অস্ত্রগুলি আরেকজন এমন নির্লজ্জভাবে আত্মসাৎ করে তার সামনেই প্রয়োগ করে বাহাদুরী নেবে—এমন বেয়াদবীতে তার হাড় পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল, সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠে বললে,—'তুই কি জানিস্? তুই নিজে দেখেছিস কাউকে একটাকা রোজ নিতে? নিজের হাঁড়ি সামলে পরের হাঁড়িতে কাঠি দিতে যাস লো সখি!'

এবারে কাতির দাঁত-খিঁচুনির ভাল অর্থ একটু টেনে করতে হয় বটে,—কিন্তু খটকা লাগলেও তা অগ্রাহ্য করে সখী লম্বা বেঢপ হাড্ডিসার হাত দুটো নেড়ে বললে, 'আমি সব জানি লো সব জানি! আমি কেন, সব্বাই জানে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ক'দিন—ক'দিন থাকে লা—'

প্রথমে তাদের ইশারা-ইঙ্গিত ও মুখ-টেপা হাসি লক্ষ্য না-করলেও তাদের অভিপ্রায় বেশিক্ষণ নেত্যর অগোচর রইল না। সে বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তখন সখীতে ও কাতিতে রীতিমতো বেধে গেছে, নেত্যকে আর তাদের প্রয়োজন ছিল না।

সখীর পুরুষালি ঢঙের সৌষ্ঠববিহীন চেহারার প্রতি বিদ্রূপ করে কান্তি বলছিল, 'হ্যাঁলো মদ্দানি! ভাত না পেয়ে ভেক নিয়েছিস তা জানি! এখন পরের মাছ দেখে ঈর্ষেয় মরে যাচ্ছিস।'

* * *

প্রতিদিন কাজের পব ওই মোড়ে একত্র হয়ে নেত্য ও কালাচাঁদ ঘরে ফেরে একসঙ্গে। আজ কালাচাঁদের দুর্বোধ্য আচরণে অন্তরে অন্তরে নিতান্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেও কাজের পর কালাচাঁদ তার সঙ্গে দেখা না করেই একলা চলে যাবে এমন কথা নেত্য ভাবতে পারেনি। তার অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ও অনেক কথা বলার ছিল। সামাদের আকস্মিক আবির্ভাবে বাধা পেয়ে তারা যে যার কাজে চলে যায়। আব কোন কথা কইবার অবসর তারা পায়নি। কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে নেত্যর দুশ্চিন্তার আর অবধি ছিল না। তার অনুচ্চারিত প্রশ্ন মনেব মাঝে কেবলি ঘুবে ঘুরে আপনা হতেই একটির-পর-একটি অশুভ উত্তরের দুঃস্বপ্ন রচনা করছিল।

কিন্তু কাজের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও সে কালাচাঁদের দেখা পেল না। এক এক করে প্রায় সমস্ত মিস্ত্রী ও মজুর বেরিয়ে গেল, তবু কালাচাঁদের দেখা নেই।

কান্তি ও সখীর দলেব ব্যঙ্গ-সম্ভাষণ পাবার কিছু আগেই সে একবার ইমারতের ভেতরে গিয়ে সন্ধান করার সঙ্কল্প করছিল।

তাদের ঝগড়ার সুযোগে সেখান থেকে সরে এসে ইমারতের দিকে চলল। সেখানে আর লোক ছিল না। বাড়িতে এখনো বালি-কাম হয়নি, আগা-পাস্তালা ভারা বাঁধা বিশাল নিজন বাড়িটাকে যেন সদ্য হাসপাতাল-ফেরত পঙ্গুর মতো অসহায় দেখাচ্ছিল। এখনো কালাচাঁদের এখানে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবু একবার সমস্ত বাড়িটা না-খুঁজে ফিরতে নেত্যর মন সরছিল না। বাঁধানো সিঁড়ি এখনো তৈরি হয়নি। নড়বড়ে একটা বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে মিস্ত্রী ও মজুরেরা উঠা-নামা কবত। একতলার ঘরগুলো খুঁজে এসে দোতলায় কাউকে পাওয়া যাবে না, একথা ভাল রকম জানলেও নেত্য সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল।

দোতলায় কেউ ছিল না। নেত্য অকারণে চার-পাঁচবার প্রত্যেক ঘর ও বারান্দা ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াল। তার আর নামতে ইচ্ছে করছিল না। নামলেই যে তার সমস্ত আশা বিসর্জন দিতে হয়—নামলেই যে তার অনিচ্ছুক বিদ্রোহী মনকে নিজের কাছে স্বীকার করতেই হয় যে, একটি দিনের জন্যেও

কালাচাঁদ তার জন্যে অপেক্ষা না-করে, তাকে সঙ্গে না-নিয়ে একলা বাড়ি চলে গেছে তাকে উপেক্ষা করে। নীচে নামলে আর যে এই উপেক্ষাকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না!

তেতলার মাত্র দেয়াল উঠেছে। ছাদের কাজ এখনো সবই বাকী; সবে টালি বসানো শুরু হয়েছে। বাঁশের সিঁড়িও সেখানে ছিল না, শুধু মিস্ত্রীদের কাজ করাব জন্য বাঁশের ভারা বাঁধা ছিল। আফিসের বাড়ি বলে সাধারণ বাসের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ির আয়তন ও উচ্চতা কিছু বেশি। দোতলা থেকেই নেত্য অন্যান্য বাড়িব তেতলার ছাদ বেশ দেখতে পাচ্ছিল। তা ছাড়া শুধু পুরুষেরা তেতলাব দেয়ালের কাজ করে ভারাব বাঁশগুলির মধ্যে ব্যবধান মেয়েদের ওঠার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। নেত্য অনেকক্ষণ ধরে একটি রেলিং-হীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে শহরের বাড়ি-বাগান-পথের জটিল সমষ্টির দিকে অন্যমনে চেয়ে কি ভাবতে লাগল। অন্ধকার হয়ে আসছিল। নীচেব অনেক রাস্তায় বাতি জ্বালা হয়ে গেল, চলন্ত গাড়ি ও মোটরেও আলো জ্বলে উঠছিল। হঠাৎ নেত্য খোলা বারান্দা থেকে পা বাড়িয়ে ভারার ধাপে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় এই সাধ্যাতীত আরোহণ প্রয়াসে দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কম্পিত দেহ আর এক ধাপ ঊর্ধ্বে তুলল, তারপর আর এক, ক্রমশঃ আরো—

*   *   *

সামাদ সর্দারের কাছে অপমানিত হয়ে কালাচাঁদ এবারেও নীরবে এসে কাজে যোগ দিল। সামাদের অপমান তার গায়েই যেন লাগেনি। তার মনে হচ্ছিল কিছুতেই আর যেন তার যায় আসে না। সমস্ত উৎসাহের উৎস তার একেবারে শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তার কাজের মধ্যে আরো দু-তিনবার সামাদ এসে তদারক করে গেল; দু-একটা দোষ ত্রুটিও ধরিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু কালাচাঁদ শুধু নীরব ঔদাসীন্যে সমস্ত মেনে নিয়ে কাজ করে যেতে লাগল। চোখের আগুন তার নিভে গেছল।

ছুটি হবার পর সে বেরিয়ে পড়ল এবং মোড়ে দাঁড়ানোর কথা আপনা হতেই স্মরণ হলেও আজ আর সেখানে অপেক্ষা করলে না। পাঁচি সমস্ত দিন একলা জ্বর নিয়ে পড়ে আছে, একটু জল মুখে দেবারও লোক নেই। সেখানে যাওয়া যে তার সবচেয়ে আগেই দরকার। না-দাঁড়ানোর এই কৈফিয়ৎ দিয়েই নিজের কাছে প্রকাশ্যভাবে সে নিজেকে সমর্থন করলে।

তার মনে একটি গোপন আশঙ্কাও ছিল যে, হয়তো তার অপেক্ষা করা বৃথা হবে, নেত্য আজ আর তার সঙ্গে দেখা করবে না!

কিন্তু পাঁচির জ্বরের ছুতোয় নেত্যর সঙ্গে মোড়ে দেখা না করে প্রতিদিনের নিয়ম ভঙ্গ করলেও, তার গতিতে ঘরে যাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততা দেখা গেল না। তার মনের মধ্যে সমস্ত বিভিন্ন ও বিরোধী ভাবনা-চিন্তার জট পাকিয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে সরল করে এই দিনটির চরম পরিণতিটুকু উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার ছিল না। সমস্ত দেহে মনে সে শুধু একটা বেদনাময় শ্রান্তি অনুভব করছিল। পথে যেতে যেতে কেবলি পাঁচির জ্বরের ঘোরে অসহায় অবস্থার কথা মনে হলেও পায়ের গতি দ্রুত করার প্রবৃত্তি তার হচ্ছিল না। যেখানে এসে প্রতিদিন সে ও নেত্য আলাদা হয়, সেই দুটি পথের সঙ্গমে এসে সে থামল। পাঁচির অসুখ! হয়তো জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। তাকে যেতেই হবে। সে বাড়ির পথে চলল।

কিন্তু নেত্যর সঙ্গে একেবারে সব মিটমাট করে ফেললে ভাল হতো না কি? সমস্ত কথা খোলসা করে বলে এই অনিশ্চয়তার উদ্বেগ একেবারে ঘুচিয়ে দেওয়া কি ভাল নয়?

কালাচাঁদ আবার ফিরল; এবার নেত্যর ঘরের দিকে। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হচ্ছিল, সে যেন জ্বরে চেতনাহীন তৃষ্ণার্ত পাঁচির আহ্বান শুনতে পেয়েও অবহেলা করে চলেছে। অকারণে তার অবাধ্য মন অসহায়, তৃষ্ণার্ত, কাতর পাঁচির একটা অতি স্পষ্ট ছবি তার সামনে বার বার তুলে তাকে বিদ্রূপ করছিল। তবু কালাচাঁদ থামল না। নেত্যর ঘরের সামনে এসে তার দরজা তালা-বন্ধ দেখেও সে ঘরের দিকে না ফিরে আবার কাজের জায়গার দিকেই চলল।

তখনও তার তৃষ্ণার্ত ছোট বোনটি তার মনের মধ্যে অতি কাতরভাবে একটু জল চাইছে।

আঠার

কাজের জায়গা পর্যন্ত কালাচাঁদকে যেতে হলো না। পথে নেত্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু দেখা হওয়া মাত্রই তার সঙ্গে ফিরলে স্বীকার করতে হয় যে, তার সঙ্গে দেখা করাই এ পথে আসার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য স্বীকার করা কালাচাঁদের পক্ষে হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল।

'আরে নেত্য যে! মাইরি দাঁড়া একটু, এই চারটে পয়সার বিড়ি কিনেই আসছি—!'

সৌভাগ্যক্রমে নিকটস্থ বিড়ির দোকানটা তার চোখে পড়েছিল। নিজের উদ্ভাবনী শক্তিতে বেশ একটু খুশি হয়েই সে বিড়ির দোকানের দিকে ব্যস্তভাবে ছুটল।

'আমার বলে মরার সময় নেই, দাঁড়াব! এত রাতে গিয়ে কখন যে রান্না চড়াব আর কখনই বা গিলব তা জানি নে।' নেত্য কালাচাঁদের অনুরোধের সম্মান না রেখে এগিয়ে চলল।

বিড়ি ক'টা কিনে নিয়ে ছুটে গিয়ে নেত্যর নাগাল ধরে কালাচাঁদ হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে বলতে চলল, 'বিড়ির দোকান এ তল্লাটে যদি থাকে তো এই একটিই আছে, জানিস নেত্য।'

নেত্যর দিক থেকে বিড়ির দোকানের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন কৌতূহলের আভাস পাওয়া গেল না।

'এমন মিঠে-কড়া বিড়ি আর কোথাও পাবি নে—, নইলে সেই কোন্ মুল্লুক থেকে এখানে আসি—বিড়ি কিনতে?'

নিজের কাছেই নিজের কৈফিয়ৎটা কেমন জোলো ঠেকছিল। নেত্যর দিক থেকেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কালাচাঁদ কৈফিয়ৎ ছেড়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তোর যে এত দেরী হলো নেত্য? গেছলি কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে হয়তো তার লজ্জাকর ব্যর্থ প্রতীক্ষার কাহিনী আঁচ করে ধরার সুযোগ কালাচাঁদ পায়, সুতরাং আর নেত্যর নীরব থাকা হলো না।

'যাব আর কোন্ চুলোয়—! সই রোজ রোজ বলে একবারটি আসিস নেত্য, তাই দেখতে গেছলুম।'

কালাচাঁদ আশ্চর্য হলো। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট স্থানে কেন সে আজ নেত্যর অপেক্ষায় দাঁড়ায়নি তার কৈফিয়ৎ নেত্য তাহলে আর চাইবে না! কিন্তু কৈফিয়ৎ না-চাওয়ার জন্য নেত্যর ওপর তার মন অকারণে হঠাৎ রাগ যে কেন করে বসল তা সে বুঝতে পারল না—এবং এতক্ষণে তার মনে পড়ল নেত্যর কাছ থেকে আজ সে কল্পিত ও সত্য সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করার সঙ্কল্প করে বিদায় নিতে এসেছে।

বিদায় নেবার ভূমিকাটা এ পর্যন্ত যথাযথ হয়নি বটে, কিন্তু দেরি করাও যায় না। অসুস্থ পাঁচি যে একলা ঘরে আছে!

কিন্তু সে কথা আরম্ভ করাও যে শক্ত। যদি নেত্য তার জাতির ও বৈধব্যের কথা ভুলে বিয়েতে আপত্তি জানালে নিজেকে অপমানিত বোধ করে! তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে হবে বলে তাকে আঘাত দেবার কোন দরকার আছে কি?

কালাচাঁদ শুধু বললে, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে নেত্য, জরুরী কথা!'

এই একটি জরুরী কথাই নেত্য সন্ধ্যার পর থেকে আশঙ্কা করে শিউরে উঠছিল! ক্ষীণ কম্পিতস্বরে সে জিজ্ঞেস করলে—'কি?'

'চল না বলছি।'

দুজনে নীরবে এগিয়ে চলল। শহরের ভদ্রপল্লী ছাড়িয়ে ক্রমশঃ তারা শহরতলীর ইতর পাড়ায় এসে পড়েছে। গ্যাসের আলোর জায়গায় পথের দূরে দূরে কেরোসিনের বাতি মিটমিট করে জলছিল। পথও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে,—কর্দমাক্ত, দুর্গন্ধ, নোংরা।

সঙ্কীর্ণতর আর একটা গলিতে বেঁকে নেত্য আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা বললে না—?'

'বলছি, অত তাড়া কিসের! না হয় আজ তোব বাড়ি দুটি খাব, খেতে দিবি নে?'

'তা খাও না। আমার রান্না তো পছন্দ হয় না, তাই এতদিন বলে বলেও খাওয়াতে পারলুম না। আজ খাবে তো বল।'

নেত্যর আশা হচ্ছিল, কথাটা এমন কিছু নাও হতে পারে—, না হওয়াই সম্ভব।

'না না, খাব কি? ঠাট্টা করে বললুম বলে! আমায় এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে—!'

'আমায় তো শুধু ঠাট্টাই করবে! কেন, এক্ষুনি বাড়ি না গেলে আর চলে না—?'

এক্ষুনি বাড়ি না গেলে যে কেন চলে না—সে-কথা জানাতে গেলে নিজের কাছে নিজের আচরণের জবাবদিহি করা বোধহয় একটু বেশি কঠিন হয়ে পড়ে, তাই কালাচাঁদ সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললে,—'না না, অনেক রাত হয়েছে—দেখছিস না—।' তারপর খানিক থেমে বললে, 'না হয় কালই সব বলব-'খন, বুঝচিস্ নেত্য, এখন যাই।'

যত সময় যাচ্ছিল পাঁচির প্রতি তার কর্তব্যের অবহেলা তাকে তত অধৈর্য করে তুলছিল।

থপ্ করে কালাচাঁদের হাতটা ধরে ফেলে নেত্য বললে,—'না না, এখন কিছুতেই যাওয়া হবে না, খাও না-খাও এই এতখানি পথ হেঁটে এসে একটু না-জিরিয়ে তোমায় যেতে হবে না।'

কালাচাঁদ সে হাতের আকর্ষণ অমান্য না করে আপত্তির স্বরে বললে, 'এত রাতে লোকে কি ভাববে বল তো?'

'কি আর ভাববে? ভাবুক না যা খুশি।'

কালাচাঁদ শুধু অনুভব করল তার প্রিয়তমার মুষ্টি তার হাতের ওপর দৃঢ়তর হলো। ভাবুক যে যা খুশি! কুছ পরোয়া নেই—এই তো উচ্ছৃঙ্খল, নির্ভয়, বে পরোয়া যৌবনের বাণী! মজুরের রক্ত-স্রোতে যৌবন তো ভিন্ন ভাষায় কথা কয় না! হয়তো কালাচাঁদ নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল, হয়তো একবার মনে হয়েছিল আসন্ন দুর্যোগের অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু নীরব মুষ্টির আকর্ষণ সমস্ত অজুহাতকে উপহাস করে যে!

নেত্য দরজার তালা খুললে চাবী দিয়ে। বাড়িওয়ালী গয়লানী সামনের আটচালায় ডিবে নিয়ে গোশালার তত্ত্বাবধান করছিল বোধ হয়। জিজ্ঞেস করলে, 'অত রাত হলো যে নেত্য?'

'এই হলো!'—বলে নেত্য দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কালাচাঁদকে আহ্বান করলে।

ডিবের ক্ষীণ আলোকে দূর থেকে গয়লানী বোধ হয় কালাচাঁদকে দেখতে পেয়েছিল। গোয়ালের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'আমি আবার ভেবে মরি! তা এখন আর রান্না-বান্না হবে কি করে?'

সন্দেহমিশ্রিত কুৎসিত কৌতুকে তার ফোলা মুখের অপূর্ব পরিবর্তন উপভোগ্য, কিন্তু নেত্যর সময় ছিল না। মুখঝামটা দিয়ে সে বললে, 'অত আদিখ্যেতা আবার কবে থেকে হলো গো তোমার? আমার খাবার জন্যে ভেবে মরছ। হাঁ করে দেখছ কি? রাস্তা থেকে লোক ধরে এনেছি!'

'ওমা, ভাল কথা বলতে এলাম তো মুখ দেখ না।'

'হাঁ করে দেখছ কি?'

'হাঁ করে দেখবো কেন না? আমরা কি পুরুষমানুষ দেখিনি—না আমাদের বয়েস ছিল না? এতদিনে তোর সুমতি হয়েছে তাই একটু আহ্লাদ জানাতে এলুম—তা মুখ দেখ না! ঝাঁটা মার!..' গয়লানী বক্‌বক্ করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল।

কালাচাঁদের হঠাৎ মনে হলো ঘরের বদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস আর টানা যাচ্ছে না।

'না নেত্য, আমার থাকার উপায় নেই। বৃষ্টি নামার আগেই আমায় পৌঁছতে হবে।'

নেত্য কিছু বললে না, কিন্তু কাতর করুণ দুটি চোখ তুলে তার দিকে শুধু তাকাল। সেই দৃষ্টিতে অনাদিকালের সমস্ত প্রিয়-বিরহ-শঙ্কিতা নারীর অশ্রুসিক্ত মিনতি। সে দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করা যায় না, তার অসম্মান করা অসম্ভব।

সমস্ত সঙ্কল্প ও সংস্কারগত সমস্ত দ্বিধা পরিত্যাগ করে কালাচাঁদ বললে, 'আচ্ছা, আজ আর তোর ভাত না খেয়ে যাচ্ছিনে, কেমন হলো তো? কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কর নেত্য।'

এত দেরী যখন হয়েছে, আর একটু দেরী হলে পাঁচির খুব বেশি ক্ষতি বোধহয় হবে না; আর সে কথা নেত্যকে তো অন্যদিন জানালেও চলে।

কালাচাঁদ নেত্যর রন্ধনের উদ্যোগ বসে বসে দেখতে লাগল।

'আর তো কিছুই নেই; বৃষ্টির দিন ডালে-চালে চড়িয়ে দিই, কেমন? তুমি আবার বেশি ঝাল খাও না!...'

'তুমি না এলে আজ হাঁড়ি ঠেলতুম ভেবেছ? দুটো মুড়ি চিবিয়ে পড়ে থাকতুম।'

'তাই কেন করলি না, এত হাঙ্গামা করার কি দরকার ছিল?'

'কি ছিল তা তুমি কি বুঝবে?'

নেত্য কটাক্ষ হেনে হাসল।

এক পশলা বৃষ্টি রান্না-খাওয়ার মধ্যে হয়ে গেল...

কালাচাঁদ পান নিয়ে বললে, 'চললুম তাহলে নেত্য?'

নেত্য মাথা নীচু করে রইল।

'চললুম, বুঝেছিস?'

'না বুঝিনি। এক্ষুনি তো আবার বৃষ্টি আসবে।'

'তা বলে সমস্ত রাত এখানে বসে থাকব নাকি?'

'তা থাকলেই বা।'—নেত্যর হঠাৎ বাইরে কি দরকার পড়ে গেল।

কালাচাঁদ খানিক দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু নেত্য এল না। বাইরে বেরিয়েও নেত্যকে কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় কেমন করে? অদৃশ্য নেত্যর উদ্দেশ্যে 'তাহলে আসি নেত্য' হেঁকে কালাচাঁদ বেরিয়ে পড়ল।

অন্ধকার কর্দমাক্ত পথ। তারাহীন আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ

চমকাচ্ছিল। খানিকদূরে যেতেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে। কিন্তু পাঁচি যে একা আছে! ভিজে ভিজেই কালাচাঁদ চলল, অদূরে সশব্দে একটা বাজ পড়ল।

দরজা যে কারণেই হোক শুধু ভেজান ছিল, ঠেলতে কালাচাঁদকে হলো না, একটু আঘাতেই খুলে গেল। একটা কেরোসিনের ডিবে বাতাসের অত্যাচারে নিবু নিবু হলেও কোন রকমে আত্মরক্ষা করে ছিল। কালাচাঁদ দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বিছানার একপাশে পাঁচি বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল, তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উনিশ

অনেকদিন বাদে আহ্লাদী বাড়ি এসেছে. আসতে সে চায়নি কিন্তু তার মা-র বিশেষ জেদে তাকে আসতেই হয়েছে।

'জানো মা, মিস্ রিং কি-রকম লম্বা? হোই বাবার মাথার ওপর আর এক হাত, আর তেমনি রোগা, যেন বেবুষ কাঠ! অত বড় ধাড়ী মাগি মা, বিয়ে হয় নি! আমি প্রথম ভেবেছিলুম বুঝি 'ফাদারের বৌ!'

'ফাদার কে?'

'ওই যে সাহেব গো, তাকে আমরা "ফাদার" বলি কিনা!'

'মিছ্ রিং ফাদারের কে হয় তাহলে?'

'কে আবার হয়? কেউ না।'

আহ্লাদীর মা কাপড় কাচা থামিয়ে গালে হাত দিয়ে চোখ দুটো প্রায় বার করে বললে, 'ওমা! ওই অত বড় আইবুড়ো মাগি পরপুরুষের সঙ্গে অমন করে থাকে?'

'সঙ্গে থাকবে কেন? মিস্ রিং-এর ঘর আলাদা, ফাদারের আলাদা। ওরা তো আর বর কনে নয়।'

'হোক ঘর আলাদা; এক জায়গায় থাকে তো? মা-গো কি ঘেন্না!'

এমনিতর তাদের কথাবার্তা হয়। আহ্লাদী অনেক কিছু দেখে এসেছে, অনেক নতুন কিছু শিখে এসেছে; সে সমস্ত বলার জন্যে, তা নিয়ে বাহাদুরী করার জন্যে তার বুক আই-ঢাই করে, কিন্তু এই বড় দুঃখ যে, মা সে সব কথা বড় বেশি বোঝে না এবং মাকে শুনিয়েও বেশি লাভ নেই। তার নতুন সেমিজ ও কাপড় ক'টাকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার সে পরে আর তুলে রাখে।

শশী এসে মাকে তাড়া দিয়ে বলে, 'ভাত দে মা শীগ্‌গির, বড্ড ক্ষিদে। কি-রে দিদি কখন এলি ?'

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি বই, খাতা, শ্লেট বার করে হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা আরম্ভ করে, শশীর কথা তার কানেও যায় না।

শশী কাছে এসে শ্লেটটায় টান দিয়ে বলে, 'শুনতে পাসনে—ডাকছি।'

'জ্বালাতন করিস নে শশী, আমার বলে এই ছুটির মধ্যে কতখানি পড়া শেষ করতে হবে! বাবা, মিস রিং এমন নয়! বেঞ্চির ওপর মুখে আঙুল দিয়ে দু-ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখবে! যীশুব গান তিনবার করে মুখস্থ বলাবে··· '

শশী শেষ পর্যন্ত শোনে না। 'মিস রিং না ফিং' বলে বিদ্রূপ করে বেরিয়ে চলে যায়!

আহ্লাদীকে আকাশ থেকে ধুলোয় নেমে তখন ডাকতেই হয়, 'শোন না শশী, সে রকম ইস্কুল তুই কখনো দেখিসনি।'

শশী দূর থেকে বলে, 'তুই দেখিচিস তো ? তোর পাঁচটা হাত বেরিয়েছে তো, তাহলেই হলো। আমার দেখে কাজ নেই।'

বিষণ্নমুখে আহ্লাদী বই শ্লেট কোলে করে খানিক বসে থাকে, তারপর রাগ করে সেগুলো তুলে রাখে।

মা ডেকে বলে, 'একটু ছিঁচকে করেছে আহ্লাদী, কাপড়গুলো মেলে দে।'

'পারব না আমি।'

'কি! পারবি না কি ? অমন মুখ করলে নোড়া দিয়ে থেঁৎলে দেব আহ্লাদী, শীগ্‌গির যা!'

'না, পারব না আমি। আমায় কেন স্কুল থেকে আনলে ? আমি এখানে থাকব না, আমায় পাঠিয়ে দাও!'

'বটে!'—মা এসে গোটাকতক কিল বসিয়ে দেয়, তার ওপর লাথি মেরে ঠেলে দিয়ে বলে, 'পারবি নে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! উনি দুদিন খেরেস্তানের ইস্কুলে গিয়ে ধিঙ্গি হয়েছেন, রোসো, তোমার আবার সেখানে যাওয়া আমি বার করছি!'

ইস্কুলে ফিরে না যেতে পাওয়ার সম্ভাবনায় অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আহ্লাদী উঠে যায়।

শশী ব্যঙ্গ করে বলে, 'কি গো মিস্ ফিং! কাঁদছ কেন ?'

বাপের সঙ্গে তাদের দেখাশুনা চিরকালই খুব কম। তিনকড়ি রাত্তে শুতে

ঘরে আসে এবং দুবেলা দুবার ঘরে এসে খেয়ে যায় মাত্র। সমস্ত দিন তার বাইরের ঘরটিতে সে শুধু সুটকেসই তৈরি করে। কিন্তু আহ্লাদী হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল যে তার বাপের মতো অমন অক্লান্ত বিরক্তিহীন শ্রোতা আর নেই। মা-র হাত থেকে ছাড়া পেলেই সে এখন বাপের কাছে গিয়ে বসে।

'এই ক'দিন বাদে আবার আমায় সেখানে পাঠিয়ে দেবে তো বাবা?'

'আর সেখানে গিয়ে কি হবে মা?'

'না বাবা, তুমি পাঠিয়ে দেবে বলে এনেছ! তোমায় পাঠিয়ে দিতেই হবে!'

'আচ্ছা, দেব মা।'

খানিক সময় গেলে আহ্লাদী বলতে আরম্ভ করে, 'সেখানে বাবা, খুব ভাল,—সকাল বেলা ঘণ্টা বাজল, অমনি উঠলুম—মুখটুখ ধুলুম, তার পরেই খাবার—শুনছ তো বাবা?'

'হুঁ।'

'তারপর কাঠের ডেস্কে বসে—ডেস্ক কি জান তো বাবা?'

'হুঁ।'

আহ্লাদীর সন্দেহ হয় বাবা বোধহয় মন দিয়ে শুনছে না। তবু খানিকক্ষণ সেখানকার কথা বিনা বাধায় বলতে পাওয়াতে যথেষ্ট আনন্দ আছে। আহ্লাদী সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তার প্রতিদিনের কার্যের তালিকা দিয়ে যায়—, স্কুলের সঙ্গিনীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে—এবং অবশেষে ক্লান্ত হয়েই উঠে যায়।—

সকালে উঠে একদিন আহ্লাদী জিজ্ঞেস করলে, 'মা—আজ রবিবার না?'

'অতশত জানি না বাপু!'—বলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,—কিন্তু খানিক বাদে ঘর থেকে অদ্ভুত চীৎকার শুনে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'ও আবার কি ঢঙ রে আহ্লাদী?'

আহ্লাদী তখন হাঁটুগেড়ে বসে হাত জোড় করে উচ্চস্বরে গান আরম্ভ করেছে,

'আমরা অবোধ শিশু;
তুমি ত্রাতা পিতা যীশু ...'

আহ্লাদীর মা বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে শশী হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ও তার হাসিকে উপেক্ষা করে আহ্লাদীর অবিচলিতভাবে গান চলেছে।

'কি হচ্ছে আহ্লাদী?'

গান থামিয়ে গম্ভীরস্বরে আহ্লাদী বললে, 'মা! প্রেয়ার করছি তো!'

তারপর মা ও ভায়ের অজ্ঞতা দূর করার জন্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝালে, যে রবিবার সকাল বেলা উঠে এমনি করতে হয়।

'না করলে যে ঈশ্বর রাগ করেন! খেঁদি একদিন শশীর মতো হেসেছিল, তাকে মিস রিং কি-রকম বকলেন, বললেন—হাসলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না! সেখানে একবার ও-রকম করে হেসে দেখিস দিকি শশী!'

আহ্লাদী অর্ধসমাপ্ত গান আবার আরম্ভ করবার উদ্যোগ করছে দেখে মা তার ঘাড়টা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—ঢের বেয়াক্কিলেপনা হয়েছে, এখন ঘুঁটেগুলো দেয়াল থেকে ছাড়াও গিয়ে দেখি! গান গাইতে আর হবে না!'

আজকের অপমানটা আহ্লাদীর বড বেশি বাজল। সে গোঁজ হয়ে বসে রইল, নড়ল না। ধমক খেয়ে জানালে—আজ রবিবার, তাকে কাজ করতে নেই।

নড়াটা ধরে হিড হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে উঠোনে ফেলে মা এক প্রচণ্ড চড় তার পিঠে বসিয়ে দিলে, তারপর সপ্তমে গলা তুলে আরম্ভ করলে—'তোর মেয়ের নিকুচি করেছে! দিন দিন চাল্লী বাড়ছে, না? উনি ইস্কুলে পড়ে নবাবজাদী হয়েছেন! বিবির এখানকার ভাত মুখে রোচে না, কাজ করতে গেলে হাতে কুট হয়। আবার রবিবার কাজ করবেন না, গাওনা করবেন!'

সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠে মুষ্টিবর্ষণ ও পদাঘাত। আজ আহ্লাদী বিদ্রোহ করল, হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে মা-র হাত ছিনিয়ে ছুটে বাইরে গেল।

পেছন থেকে মা আশীর্বাদ করল, 'বেরো বেরো, একেবারে কেওড়াতলায় যা। আর যেন তোর মুখ আমায় না দেখতে হয়!'

কেওড়াতলায় যেতে আহ্লাদী অবশ্য পারল না, যাবার জন্য জায়গাও সম্প্রতি চোখে পড়ল না। পাঁচি মাসীর সঙ্গে তার মায়ের ক-দিন মনোমালিন্য হওয়ায় মাসীর বাড়ি যাওয়া তাদের নিষেধ হয়ে গেছল। মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই হোক বা মাসীর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের জন্যই হোক সেই মাসীর বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে ডাকলে—'মাসী-মা গো!'

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সকালবেলা হলেও মাসীর রান্নাবাড়ির কোন উদ্যোগের চিহ্নও সে দেখতে পেল না। ভিতরের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। সে ঘরে থাকলে মাসী নিশ্চয়ই উত্তর দিত। এমন করে ঘরের দরজাটা খুলে হাট করে রেখে মাসী কোথায় যে যেতে পারে—তাও সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। পুকুরের ঘাটে মাসী যে নেই তা সে আসবার

সময়ই লক্ষ্য করেছে। কৌতূহলী হয়ে ভিতরের দরজাটা ঠেলতেই ভেতরের যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে তার সমস্ত কান্না এক পলকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পাঁচি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। কোন নিদারুণ রোগে বিবর্ণ বিকৃত মুখের একপাশে গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল বোধহয়; এখন শুকিয়ে কালো চাপড়া বেঁধে গেছে। নিস্পন্দ দেহ দেখলে প্রাণ এখনও আছে কিনা সন্দেহ হয়। একটি কলসী কাত হয়ে পড়ায় সমস্ত ঘর জলময় হয়ে গেছল, এখনও সে জল শুকোয়নি। বোধহয় জ্বরের মাঝে দুর্বল-হাতে জল গড়াতে যেতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, শুধু গেলাসটা তখনও একটা হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল।

কিছুক্ষণ বিহ্বল বিমূঢ় আহ্লাদীর নড়ার ক্ষমতা ছিল না। এই আকস্মিক আঘাতের প্রথম বিস্ময় ও বিহ্বলতা দূর হলে সে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে ডাকলে, 'মা-গো, মাসীর কি হয়েছে দেখে যাও।'

কুড়ি

বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা দুপুর হয়ে গেলেও আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার। একঘেয়ে অস্বস্তিকর বাদলায় শহরটাকে অত্যন্ত পীড়িত শ্রীহীন অপরিষ্কার দেখাচ্ছিল। সজ্জিতা বারবিলাসিনীর মতো যেন তার সমস্ত নকল ঔজ্জ্বল্যটুকু এই বাদলায় ধুয়ে গিয়ে কদর্যতা কুশ্রীতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অনতিবৃহৎ কাঠের একটা গাড়ির মতো লোহার চাকা দেওয়া ঘরে কাঠের লম্বা টেবিলের দুধারে বেঞ্চিতে ভিড় করে গাড়োয়ানেরা চায়ের জন্যে বসেছিল। গায়ে খাকি রঙের কোট, তার ওপর নম্বরী কাপড়ের গোল তালি। গাড়ির আড্ডা অনবরত গাড়ি-ঘোড়ার যাতায়াতে, কাদায়, ঘোড়ার ময়লায় ও ছেঁড়া ঘাসের জঞ্জালে একাকার, একটা শ্বাসরোধকারী ঘোড়ার পচা-ময়লার দুর্গন্ধে সমস্ত জায়গাটা আমোদিত হয়েছিল। গাড়ির আকারের কাঠের ঘরটার বাইরের দিকে একটা রঙচটা টিনের পাত আঁটা, তাতে অস্পষ্ট ছোট ছোট লাল হরফে "Cabin for Hackney Carriage Drivers" লেখা—ভেতরে একাধারে একটা প্রকাণ্ড কেটলিতে চুলোর ওপর জল গরম হচ্ছিল। বাদলায়—চায়ের এবং নেড়ো বিস্কুটের চাহিদা একটু বেশি। যে দুটি রোগা কালো কণ্ঠা-বেরোনো ছেলে চা-বিস্কুট সরবরাহ ও উচ্ছিষ্ট কাপ ধোয়ার কাজ করছিল, তারা সে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছিল না। চা তৈরি করছিল কেবিনওয়ালা স্বয়ং—প্রৌঢ় মুসলমান, বেশ ভারিক্কিগোছের

চেহারা; গোঁফ-দাড়ির পরিচ্ছন্নতা ও দেহের স্থূল-বাঁধুনী ভারি ট্যাঁকের সাক্ষ্য দেয়। ভিতরে ও বাইরে সমান গোলমাল। বাইরে গাড়ির আড্ডার পাশে ভিজে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গুটিকতক গাড়োয়ান বসে একটি ভদ্রলোককে ঘিরে বচসা করছিল। সম্মিলিত আক্রমণে নিরীহ ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে অসহায়ভাবে চারদিকে চাইছিলেন, হঠাৎ তার ভিতর থেকে একজন গাড়োয়ান চিলের মতো ছোঁ মেরে ঝড়ের বেগে তাঁর ডান হাতের কব্জিটা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললে, 'কোথায় সওয়ারী আছে বাবু?' নিরীহ ভদ্রলোক শহরের অভিজ্ঞতা বোধহয় খুব অল্প। খানিক কথা কইতে পারলেন না, তারপর যখন ঠিকানা বলার মতো জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন রুষ্ট গাড়োয়ানের দল দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

একজন ধমক দিয়ে বললে, 'আমি তো আগে দেড়টাকা বলেছি হুজুর,— আপনি যে ওর গাড়িতে চড়লেন?'

গাড়োয়ান তখন ঠিকানার অপেক্ষা না করে একেবারে ওপরে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরে বসেছিল, বললে, 'আরে আমিও দেড় টাকায় যাব—।'

কয়েকজন গাড়োয়ানের মধ্যে এই ছোঁ মারার অন্যায্যতা নিয়ে তর্ক চলছিল। যে গাড়িতে তিনি উঠেছিলেন, সে গাড়ির গাড়োয়ানের এই আকস্মিক লুণ্ঠন যত দোষেরই হোক না, ভদ্রলোক মনে মনে তাকে বোধহয় এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ করার জন্য আশীর্বাদ করছিলেন।

গাড়োয়ান ওপর থেকে আর একবার হাঁকলে, 'কোথায় যাব বাবু?'

ভদ্রলোক জানালেন।

একজন গাড়োয়ান ফুটপাথ থেকে বললে, 'ও গাড়িতে এইমাত্র মুর্দা বয়ে আসছে বাবু।'

গাড়োয়ান ঘোড়া দুটোকে ছিপটি লাগিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বললে, 'তোর।'

ভদ্রলোক বুঝলেন কিনা বলা যায় না। গাড়োয়ানদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল।

* * *

কেবিনের একপ্রান্তে একটা বেঞ্চির শেষে বসে অশান্ত কর্মকার অন্যমনস্কভাবে কেবিনের কাঠের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল। গাড়ির আড্ডার এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা অবশ্য তার চোখে পড়ে নি। মনে মনে সে একটা চিঠির খসড়া করছিল। প্রতিবেশী গাড়োয়ানদের থেকে সামান্য পরিচ্ছন্নতা

ছাড়া বেশ-ভূষার আর কোন পার্থক্য না থাকলেও তার বিপুল আকারই তাকে বিশেষত্ব দান করেছিল। এই ছোট ঘরে বামনের দলে তাকে অতিকায় দানবের মতো দেখাচ্ছিল। সামনের টেবিলে অভুক্ত চায়ের কাপ পড়েছিল।

একে আলোকের অভাব, তার ওপর বিড়ির অজস্র ধোঁয়ায় ঘর আরো অন্ধকার। একটা ছোকরা চাকর অসাবধানে কার পায়ে খানিকটা গরম চা ফেলে দিয়েছিল, তাই নিয়ে তুমুল হাঁকাহাঁকি চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধাতেই অভ্যস্ত অশান্ত কর্মকারের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্ট্যান্‌লির সঙ্গে বাঁকাবুড়ীর মৃতদেহ দাহ করার পর আর সে দেখা করেনি। তাকেই একটা চিঠি লেখার কথা ভাবছিল। ভাবছিল লিখবে—'আমার ঠিকানা সেদিন আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম ঠিকানা আমার নেই। ঠিকই বলেছিলাম, কিন্তু আজকাল কতক বিষয়ে আমার মত পরিবর্তন হয়েছে, মনে হচ্ছে ঠিকানা না থাকা নিয়ে শ্লাঘা করার কিছু নেই, এবার ঠিকানা করব ভাবছি—'

সামনে অপর দিকে বেঞ্চির ওপর দুটো পা তুলে বসে অত্যন্ত অশোভনভাবে একটা আধা-বয়সী গাড়োয়ান অপরিষ্কার দাঁতের পাটি বার করে দাঁত খুঁটছিল। অভুক্ত চায়ের কাপের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ অত্যন্ত পরার্থপর হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে লাল মাখান খড়কে সমেত হাতটা দিয়েই অশান্তকে সচেতন করে বললে, 'চা ঠো পিয়ে লে ভাই।'

অশান্ত মৃদু হেসে চায়ের পিয়ালাটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিল। আরম্ভটা ঠিক তার পছন্দ হচ্ছিল না। আচ্ছা, লেখার সময় একটু অন্য রকম করে লেখা যাবে, স্ট্যান্‌লি যেন ভুল না বোঝেন। তারপর—'এক পলকে আদর্শ মানবসমাজ গড়ে ওঠে না। দু-হাজার বছর হতে চললো যীশু মানবের জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন, বুদ্ধ দেহ রক্ষা করেছেন আরো আগে। মানুষ আর কি কাঁদে না? এমন কিছু দুঃখ আছে যা জীবনের অঙ্গ, সেটা অবশ্যম্ভাবী, সেটা আবশ্যকীয়, এমন কি সেটা না থাকলে জীবনের মূল্য থাকে না। সে দুঃখের জন্য মানুষ অশ্রুজল ফেলে, ফেলুক। কিন্তু যেসব দুঃখ দূর করার জন্য যুগে যুগে বুদ্ধ, খ্রীস্টেরা প্রাণ দিয়েছেন সে দুঃখ অনিবার্য নয়। সে দুঃখের মূল মানবের অন্ধতায় মানবের হৃদয়হীনতায়, তার পাশবিকতায়। সে মূল উচ্ছেদ করা সম্ভব হলো কি? খ্রীস্ট ও বুদ্ধেরা একদিনে মানবসমাজকে চিরশুচি করে দিতে চেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব চেয়েছিল একযুগে পৃথিবীতে স্বর্গ আনতে। এই অধৈর্যকে নিন্দা করার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু এই অধীরতা যে নিষ্ফল এটুকু বলার সাহস আমার আছে। আদর্শ মানবসমাজের জন্যে আদর্শ মানব দরকার। সমস্ত

মানব একদিনে আদর্শ হয়ে ওঠে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের গতিবেগ নিয়মিত করে বটে।··তা ছাড়া আদর্শ অর্থে একটা কঠিন সুস্পষ্ট অবস্থা নয়, একটি তরল গতিশীল অনির্দিষ্ট অবস্থা।··· বাইরের ধাক্কায় মানুষকে আদর্শ হবার পথে ঠেলা যায় না। যে ঠেলতে যায়, সে প্রথমত নিজের অহঙ্কারে আপনাকে প্রকাণ্ড করে দেখে, দ্বিতীয়ত মানুষের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার ও অসম্মান করে। যতবড় মনীষী, যত বড় সত্যদ্রষ্টা ঋষিই হোন না, মানুষ শুধু নিজের জীবনের উপলব্ধি থেকে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতে পারেন মাত্র, কিন্তু আদেশ করাব অধিকার কারো নেই।

আদর্শ মানবসমাজের জন্যে ব্যাকুলতা মানুষ আজ তো সবে প্রকাশ করেনি। যুগে যুগে দেশে অসংখ্য রচনায় নানাভাবে এই সমাজের নক্শা আঁকা আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন এই আদর্শবাদীদেরই আদর্শের মধ্যেও এত পার্থক্য যে "ওয়ান ম্যানস্ হেভন্ ইজ্ অ্যানাদার ম্যানস্ হেল্।' মানুষের এই পার্থক্য,—এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করে, আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে যে সমন্বয়ে তার রসায়ন কোন একজন মানুষের জানা নেই···'

'চা-টা তো বরফ হয়ে গেল বাপু, আচ্ছা ভোলা লোক তো তুমি!' হিতৈষী গাড়োয়ান টেবিলের ওপর রক্ষিত চায়ের পেয়ালায় একটা আঙুল ডুবিয়ে তার উত্তাপ অনুভব ক'রে নিয়ে বললে, 'সরবৎ হয়ে গেছে— ছ্যা!'

'থাক, ও চা আব খাব না।'

হঠাৎ এই উপদ্রবে বাধা পেয়ে অশান্তর চিন্তার ধারা ভিন্নপথে প্রবাহিত হলো। 'আমি যাদের জীবন যাপন করছি তাদের দেহের ও মনের কদর্যতা, গ্লানি, অপরিচ্ছন্নতা আমাব প্রীতিকর যে নয় একথা বলা বাহুল্য—শুধু, অপ্রীতিকর নয়, সে কদর্যতা আমাকে পীড়িত করে। তবে কেন আমি এ-জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করেছি জিজ্ঞাসা করতে পারেন! আমার উত্তর, পীড়িত হবার জন্য। এদের দৈহিক-মানসিক-নৈতিক দৈন্য ও স্বাস্থ্য-হীনতার পরিমাণ চাক্ষুষ উপলব্ধি করার জন্য।··· বাইরে থেকে অত্যন্ত সবল কল্পনা নিয়েও এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের পঙ্কিলতা অনুমান করা যায় না। তাই ওপর থেকে পথ বলে যা নির্দেশ করা যায়, এদের সাথে নীচে নেমে এসে দাঁড়ালে তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। পথ-নির্দেশের সার্থকতায় আমার বিশ্বাস ভেঙে গেছে। আকাঙ্ক্ষা ডানা মুড়ে মাটিতে নেমে এসেছে। তাই ভাবছি ঠিকানা করব একটা।···পায়ে যার জোর নেই তাকে টেনেটুনে কোনরকমে সোজা করে

দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু সে অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এদের শুধু পায়ের জোর নেই তো বটেই, পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষ হয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছাও মরে গেছে। বৃহত্তর সত্তার জন্য ব্যাকুলতা যদি এদের ভেতর থেকে না জাগে তাহলে বাইরে থেকে টেনে ঠেকা দিয়ে কতক্ষণ রাখা যাবে ?···টেনে তুলতে আমি চাই না, ওদের জীবনের পাথেয় অনুযায়ী ওদের পঙ্গুতা দূর করে ওদের সাথে হাত ধরে এই অন্ধকার হতে পথ খুঁজতে চাই। পথ আমি জানি না এ-কথাটা এত দিন নিজের কাছে স্বীকার করার সাহস আমার হয়েছে। আমার মনে হয়, আমি শুধু ক'টি চিরন্তন সত্যের দীপ পেয়েছি—আমি সেই মামুলি সত্যে বিশ্বাস করি যে, মানুষের সত্যকার মুক্তি তার নিজের ভেতরকার প্রেরণা ছাড়া আসে না—আমি বিশ্বাস করি, অনাবৃষ্টির দুর্দশা বন্যায় দূর হয় না—দেহের মতো সমাজের বিস্ফোটক যখন প্রাণধারাকে দূষিত করে নিশ্চল করে তোলে তখন তাকে সবলে চেপে বসিয়ে দিয়ে সমাজকে নিরাময় করা যায় না, আগে তার বিষকে দূর করতে হয়।···আমার দায়িত্বের তুলনায় আমার শক্তি অত্যন্ত অল্প, কিন্তু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহায়তার অপেক্ষায় বসে থাকা আমি নিষ্ফল মনে করি। প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাই আমার খুব কম।···আমার সামনে একটি মাতাল গাড়োয়ান অনেক কিছু আস্ফালন করছে, অন্যান্য সকলে তার সেই প্রলাপ অত্যন্ত উপভোগ করছে···, এদের নিত্য জীবনের ভাষা যে দিনের-পর-দিন শোনেনি সে বুঝতে পারবে না কোন্ স্তরে এখনও এরা আবদ্ধ, অত্যন্ত স্থূল যৌন সম্বন্ধের কদর্যতা এদের সমস্ত মন কিরূপ অধিকার করে আছে। ভাষায় এদের ক্ষণে ক্ষণে তারই প্রকাশ।···আমি চাই ওই বীভৎসতা, ওই পঙ্গুতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলে বিপুল অসন্তোষ তাদের মনে রোপণ করতে। বৃহত্তর সত্তার ব্যাকুলতা সেই অসন্তোষ থেকেই আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। এর বেশি কিছু আমি আজও জানি না। দেহের শ্রমের পরিবর্তে ওরা যা পায় জীবন-নির্বাহের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, তা আমি জানি এবং ওদের মানসিক ও নৈতিক যে আর্থিক দৈন্যের ফল তাও আমি মানি।

কিন্তু···' অশান্ত-র চিন্তাধারায় হঠাৎ ছেদ পড়ল।

'তুমি তো আচ্ছা বেয়াক্কেলে লোক বাপু? এক কাপ চা খেয়ে তিন ঘণ্টা ধরে তিনজনের জায়গা দখল করে বসে থাকলে আর সব খদ্দের যায় কোথায়?'—কেবিনওয়ালা স্বয়ং এসে খিঁচিয়ে উঠল।

অশান্ত ধীরে ধীরে উঠে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল।